অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ দীপায়ন প্রকাশিত অন্যান্য বই ॥

পল লাফর্গ
সম্পত্তির বিবর্তন

রমেশচন্দ্র দত্ত
পিজ্যাণ্টি অব বেঙ্গল

লুইস হেনরী মর্গান
এনসিয়েণ্ট সোসাইটি

চার্লস ডারউইন
ডিসেণ্ট অফ ম্যান

নির্মাল্য নাগ
শিল্প চেতনা

স্টিভ নেলসন
ভলানটিয়াস

আনা ফ্রাঙ্ক
গল্প উপন্যাস স্মৃতিকথা

ভেরকর
সাইলেন্স অব দি সী

এম গোরচাকভ্
স্তানিস্লাভস্কীর নাট্য পরিচালনা
(রোমাণ্টিক নাটক)

গেব্রিয়েল পেরী
রাত প্রভাতের গান

ম্যাকসিম গর্কি
মা

গোলাম কুদ্দুস
সুরের আগুন
বাঁদী
মরিয়ম
লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে
(বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত)
উজানীয়া
সম্বোধন

কৃষণ চন্দর
লালতাজ
পিকনিক
জঙ্গল কী রাজা

হাওয়ার্ড ফাস্ট
টম হান্টার
কনসিভ্‌ড ইন লিবার্টি
টনি অ্যাণ্ড দি ওয়াণ্ডারফুল ডোর

জিওফ্রে ট্রীজ
বোজ এগেনস্ট দি ব্যারণস

দাদর পুলের বাচ্চারা

ক্লষণ চন্দর

ভাষান্তর / অর্ঘ দাশ

গত দু দিন ধরে পেটে কিছু পরেনি। অর্থহীন, বিরক্তিকর এই জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে অন্ধকার ঘরে বসে ছেঁড়া গেঞ্জি থেকে উকুন বাচছিলাম। এমন সময় ভগবান আমার এই অন্ধকার ঘরে এসে ঢুকলেন। বললেন, "আমি তোমাদের শহরের বাচ্চাদের অবস্থা দেখতে চাই।"
বিরক্তি প্রকাশ করে বললাম, "যাও, যাও,—আমার এখন সময় নেই।"
"তুমি এখন আমার সঙ্গে গেলে মোড়ের রেস্তোরাঁয় বসিয়ে আমি তোমাকে দু-পিস মাখন রুটি, একটা ডিমের ওমলেট আর এক কাপ চা খাওয়াবো।" ভগবান বললেন।
"সত্যি বলছ, না মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছ।"
পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বার করে ভগবান আমার চোখের সামনে নাচাতে লাগলেন। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম আমি।
"আগে বললে না কেন," বিরক্তি দেখিয়ে বললাম। "বোম্বাই শহরে কোন কাজ বিনে পয়সায় হয় না। শুধু শুধু সময় নষ্ট করলে।"
ইরানী রেস্তোরাঁয় গিয়ে বেয়ারাকে বললাম, "দেখ ভাই, সাহেব যা চায় দিও, কিন্তু আমাকে এখনই চার পিস স্লাইসরুটি মাখন দিয়ে, একটা ডবল ডিমের অমলেট আর ডবল চা এখনই দিতে হবে।"
আমার বিরোধীতা করে ভগবান বললেন, "কিন্তু আমি তো কেবল দুটো স্লাইস রুটি, একটা ডিমের অমলেট এবং এক কাপ চা খাওয়াবো বলেছিলাম।"
"তুমি স্বর্গের রেস্তোরাঁর কথা মাথায় রেখে অর্ডার দিয়েছো হয়তো। কিন্তু এটা স্বর্গ নয়, এটা বোম্বাই শহর। আমি বললাম, এখানকার রকম-সকম একটু ভিন্ন ধরনের। তুমি এখনো বোম্বাইয়ের পাঁউরুটির পিস দেখনি। এতো মিহি ও পাতলা করে কাটা যে এদিক ওদিক স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। ওর ওপর একটু মাখন লাগিয়ে নিলে অনায়াসে শেভ করতেও পারবে, আর ডিম? বোম্বাইয়ের মুরগির ডিম এতো ছোট যে ঐ ডিমের ওমলেট খেতে গেলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। বাকি থাকে এক কাপ চায়ের কথা। এই চায়ের কাপ এতো বড় যে চোখের জলও তাতে অতি কষ্টে ধরে।"
এভাবে বোঝানোর পরেও ভগবান আমার কথা মানলেন না। আমিও ওর কথা মানলাম না। মিনিট দশেক ধরে আমরা দুজনে তুমুল ঝগড়া করতে লাগলাম।

শেষে অবস্থা ভীষণ আকার ধারণ করলে রেস্তোরাঁর মালিক পুলিশ ডাকার ভয় দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে ভগবান বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে আমার জন্ত চার পিস স্লাইস রুটি, একটা ডবল ডিমের ওমলেট এবং ডবল চায়ের অর্ডার দিলেন। নিজের জন্ত কেবল একটা অ্যাসপ্রো বড়ির অর্ডার দিলেন।
আমি বললাম, তুমি মিছিমিছি ঝামেলা করতে গেলে কেন। তখনই যদি আমার কথা শুনতে, তাহলে আর এ সময় অ্যাসপ্রো খেতে হতো না।
ভগবান লজ্জা পেয়ে বললেন, "ভাই আজকাল আর আগের মতো সে রকম ফরেন এক্সচেঞ্জ পাওয়া যায় না। স্বর্গ থেকে বোম্বাই আসার জন্ত আমি মাত্র একশো টাকা পেয়েছি। জানি না আরো কতো দিন আমাকে এখানে থাকতে হবে। তাই খুব হিসেব করে আমাকে খরচ করতে হচ্ছে।"
"আরে ওসব ফালতু কথা ছাড়ো", আমি বিরক্তি প্রকাশ করে বললাম। "তোমার আবার ফরেন এক্সচেঞ্জ পেতে অসুবিধে! এসব অসুবিধে তো আমার মতো গরিব লোকদের জন্ত। আমাদের দেশের একটা সাধারণ কারখানার মালিকের যেখানে ফরেন এক্সচেঞ্জ পেতে অসুবিধে হয় না, সেখানে তোমার মতো সারা দুনিয়ার কারখানার মালিকের ফরেন এক্সচেঞ্জ পেতে অসুবিধে হতে যাবে কেন? আমাকে একথা বললেই বিশ্বাস করব আমি?
"তুমি বুঝতে পারছ না," আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন ভগবান, "ভগবানকেও নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়, নইলে দুনিয়া চলবে কি করে।"
"দুনিয়া চলতে কি অসুবিধে হবে?"
"কি অসুবিধে হবে? আমি যদি তোমার এই পাউরুটির টুকরোটাকে লোহার পাত করে দি, তাহলে ওটা তুমি চিবোতে পারবে?"
আমি বললাম, "বোম্বাইয়ের কোন কোন হোটেলে লোহার পাতের থেকেও কঠিন স্লাইস রুটি চিবোতে হয়।"
"তোমার চায়ে আমি বিষ মিশিয়ে দিলে কি তুমি মারা যাবে না?"
"আরে বোম্বাই শহরে আমরা প্রতিদিন বিষ মেশানো চা খাই।"
"আমি যদি ঘণ্টায় তিন মাইল গতিতে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পাঠাই, তাহলে তোমরা মারা যাবে না?"
আমি চুপ করে গেলাম। ভগবানের এই কথাটার মধ্যে কোন ভুল নেই। আমি মাথা নিচু করে প্লেটের মধ্যে ওমলেট খুঁজতে লাগলাম।
একটু পরে আমরা দাদার পুলের নিচে এসে দাঁড়ালাম। পুলের নিচে একটা মন্দির। মন্দিরে বসে এক সাধু ভাঙ খাচ্ছে। রেল স্টেশনের লোহার রেলিঙে

গা লাগিয়ে এএটা লোম ওঠা ময়লা কুকুর শুয়ে রয়েছে। একদিকে জঞ্জালের স্তূপ আর একদিকে দাদার পুলের সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে ময়লা কাপড়-জামা পরা ভিখিরীরা বসে বসে ভিক্ষে করছে। পরিবেশটা এমনই যেদিকে তাকাও অসুন্দর ছাড়া আর কিছু চোখে পড়বে না।

ভগবান নাক মুখ সিঁটকে বললেন, "এ কোথায় তুমি আমাকে নিয়ে এলে ?"

"বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে।"

"কিন্তু এখানে বাচ্চা ছেলে কোথায় ?"

আমি বললাম, "বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করার আগে আমরা নিজেরা বাচ্চা হয়ে গেলে ভালো হয় না ? আমার মনে হয় এটা তুমি সহজেই করতে পারবে। এর জন্য ফরেন এক্সচেঞ্জ এর দরকার হবে না।"

ছোটছেলের রূপ ধারণ করতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। পর মুহূর্তেই আমরা বাচ্চা ছেলে হয়ে গেলাম। আমাদের দুজনেরই পরনে একটা করে ছেঁড়া ইজের আর একটা করে ময়লা ছেঁড়া-ফাটা গেঞ্জি। আমার হাতে একটা পেয়ারার ঝুড়ি। ভগবানের মাথায় একটা কাঠের ট্রে। ট্রেতে বাচ্চাদের পড়ার জন্য সুন্দর সুন্দর রঙিন বই। দ্রুত পায়ে আমরা দুজনে দাদার পুলের সিঁড়ির এক একটা ধাপ টপকে টপকে পুলের ওপর উঠে গেলাম। মাথা থেকে ঝাঁকা নামিয়ে নিচে রাখলাম।

"এই, কি করছিস কি ?" একটা বুড়ি চিৎকার করে উঠল, "এখান থেকে ঝাঁকা হটা।"

বুড়িটা দেখতে কুৎসিত, গলার স্বর ভয় ধরানো কর্কশ। বুড়িটা আমারই মতো ঝুড়িতে পেয়ারা সাজিয়ে বিক্রি করছে।

"এটা সরকারি পুল, এখানে যে কেউ মাল বিক্রি করতে পারে।" আমি বললাম, "দেখতেই তো পাচ্ছ চারপাশে আরো কতো লোকে মাল বিক্রি করছে। আমি কেন বেচতে পারব না ! এ কি তোমার বাবার পুল ?"

বুড়ির গা সেঁটে একটা আট বছরের ছেলে বসে রয়েছে। ছেলেটার সামনে আমারই মতো একটা ঝাঁকা। ঝাঁকা ভর্তি কলা। চোখ কটমট করে ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এ্যাই, ঝাঁকা সরাবি কি না বল ?"

ছেলেটার কথার কোন উত্তর দেবার আগে আমি ওর দিকে তাকালাম। বয়স ও শারীরিক শক্তির দিক থেকে ওকে আমার থেকে দুর্বল বলেই মনে হলো। তাই আমিও কড়া সুরে বললাম, "না তুলব না, এখানেই বসব।"

ছেলেটা বিদ্যুৎ বেগে উঠে দাঁড়াল। চক্ষের নিমেষে আমার পেটের মধ্যে একটা

পা চালিয়ে দিল আর দুম করে একটা ঘুষি মারল মুখে। আমি চিৎপটাং হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। ভগবান আমাকে ওর আক্রমণ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। ওঁর মুখেও একটা ঘুষি পড়ল। নাক দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়তে লাগল।

"তোদের ঝাঁকা তোল।" হুকুমের সুরে ছেলেটা বলল।

আমি ভগবানের দিকে তাকালাম। ভগবান তখন নাক পোঁছায় ব্যস্ত। তাই আর কথা না বাড়িয়ে ঝাঁকা মাথায় তুলে চুপচাপ সামনের দিকে এগোতে লাগলাম। তিন-চার পা সামনে যাবার পর ভগবান আমাকে ধীর স্বরে বললেন, "আমি ওকে এমন একটা ঘুষি মারতে পারতাম যে ও চোখে অন্ধকার দেখত। কিন্তু মারলাম না, কারণ ওটা আমার নীতি বিরুদ্ধ।"

"ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ," কোমর মালিশ করতে করতে বললাম আমি।

আরো চার পা আগে যেতেই একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হলো। ছেলেটা একটা কাঠের ট্রেতে ফাউন্টেন পেন বিক্রি করছে, আর এই বলে খদ্দের ডাকছে, "আসল শেফর পেন, মাত্র চার আনা।"

"আসল শেফর পেন তো পঁচাত্তর টাকাতেও পাওয়া যায় না। এ কি করে চার আনায় বিক্রি করছে।" ভগবান বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন।

"হয়তো এই ছেলেটার বাবা কোটিপতি আর ও ভগবানের সৃষ্ট এই পৃথিবীর ভালো করতে চায়। এসো আমরা এই ভালো ছেলেটার পাশে বসে পড়ি।" আমি বললাম।

"যাও, আগে যাও", ছেলেটা আমাদের ওর পাশে যেতে দেখে খেঁকিয়ে দেওয়ার সুরে বলল, "অন্য কোথাও জায়গা দেখ, আমার খদ্দের নষ্ট করো না।"

"বন্ধু, আমার কাছে পেয়ারা আর এর কাছে বই, আমরা তোমাদের ব্যবসার কি ক্ষতি করতে পারি?" আমি বললাম।

তবুও ছেলেটা তিক্ত স্বরে বলল, "মনে হচ্ছে দাদর পুলে নতুন এসেছ। নইলে এমন কথা বলতে না। ওহে দাদা, খদ্দেরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছ কখনো? মুহূর্তের মধ্যে খদ্দেরের মেজাজ কিভাবে বদলে যায় তা জানা আছে তোমাদের? ফাউন্টেন পেন কিনতে এসে পেয়ারা নিয়ে চলে যাবে⋯ যাও, যাও, ভাগো এখান থেকে, নইলে⋯"

ছেলেটা আমাদের থেকে শক্ত-সমর্থ। ফলে আমরা দুজনে তখনই ওখান থেকে পালিয়ে এলাম।

সামনে এগিয়ে গিয়ে ভগবান বিরক্তির সঙ্গে বললেন, "তুমি মনে করো আমাদের

থেকে ওর গায়ে জোর বেশি? তোমার ধারণা একদম ভুল। আমি ওকে ওখানেই শেষ করে দিতে পারতাম। কেবল কাজটা আমার নীতি বিরুদ্ধ বলে করলাম না।"

আমি ওঁর সুরে সুর মিলিয়ে বললাম, "তা অবশ্য ঠিক।"

এখন আমরা পুলের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। পথে কেউ আর আমাদের পাশে বসতে দেয়নি। এখানে, পুলের একেবারে এই শেষ প্রান্তে, একটা ছেলে, ছেলে বলা ভুল হবে, এক তরুণ—এই কুড়ি বাইশ বছর বয়স হবে, গায়ের রং কালো, একটা পুরনো ছাতা খুলে তার মধ্যে রঙিন রুমাল সাজিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিক্রি করছে। খদ্দেরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ও যেই ছাতাটা ঘোরায় অমনি আমাদের চোখের সামনে রামধনু রং খেলে যায়।

ভগবান অত্যন্ত মিষ্টি, নরম সুরে ওকে বললেন, "আমরা তোমার পাশে দোকান লাগাই?"

ছেলেটা বলল, "লাগাও, তবে তোমাদের দুজনকেই চার আনা করে পয়সা দিতে হবে।"

ভগবান তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে ওকে দিয়ে দিলেন। আমরা দুজনে পাশাপাশি বসে মালপত্র বিক্রি করতে লেগে গেলাম। দেখতে দেখতে এক ঘণ্টা সময় কেটে গেল। এই সময়ের মধ্যে আমি ছটা পেয়ারা বিক্রি করলাম, কিন্তু ভগবান একটাও বই বিক্রি করতে পারলেন না।

ভগবান হতাশ হয়ে বললেন, "আমি এতো উৎসাহের সাথে বাচ্চাদের জন্য বই নিয়ে এলাম, কিন্তু কেউ একটা বইও কিনল না।"

ছেলেটা ব্যঙ্গ ভরে হাসতে লাগল। ভগবান ওকে জিজ্ঞেস করলেন, "এতে হাসির কি আছে? বোম্বাই শহরের বাচ্চারা কি লেখাপড়া করে না?"

"নিশ্চয় পড়ে," ছেলেটি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, "আমি নিজেই তো বি. এ. পাশ।"

"বি. এ. পাশ করে তুমি রুমাল বিক্রি করছ।" ভগবান গভীর বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

ছেলেটি আবার হাসল। নিজের এক সঙ্গীকে ডাকল, "এই ভিক্টর এদিকে এসো।"

ভিক্টর চোরাই ঘড়ি বিক্রি করছিল। আমাদের কাছে এলো। রুমাল বিক্রি করা ছেলেটা ভিক্টরের পরিচয় দিয়ে বলল, "এর নাম ভিক্টর, ও এফ্. এ পাশ।

তারপর ও আশেপাশের অন্য ছেলেদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে

লাগল, "এর নাম শরীফ, ও এন্ট্রান্স পাশ। এর নাম ঘোমে, ও ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে। এর নাম গোরখা, ও ক্লাস ফাইভে পড়ে। মেয়েদের ওড়না বিক্রি করে ও..."

"কিন্তু..." ভগবান ওদের সবার দিকে তাকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "কিন্তু তোমরা স্কুলে বা কলেজে যাও কখন?"

"আমরা কখনোই স্কুলে বা কলেজে যাইনি।" ওরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠল।

"তাহলে তোমরা নিজেদের বি. এ, আই. এ, এন্ট্রান্স পাশ বলো কি করে?"

"এই জন্ত বলি যে, আমরা যদি ঠিকমতো স্কুল কলেজে যেতাম, তাহলে আমি বি. এ পাশ হতাম, শরীফ হতো এন্টান্স পাশ। এই গোরখা যদি স্কুলে যেতো তাহলে আজ ও মেয়েদের ওড়না বিক্রি না করে স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ত।"

আমাদের দুজনকে ঘিরে বেশ ভিড় জমে যাওয়ায় কোথা থেকে এক হাবিলদার চলে এলো সেখানে।

"কি হয়েছে, কি হয়েছে, হল্লা কিসের?" বলতে বলতে ও ওর বেঁটে লাঠিটা হাওয়ায় দোলাতে লাগল।

"কিছু হয়নি হাবিলদার সাহেব।" ভিক্টর ওর কালো ঠোঁটের ভেতর থেকে সাদা দাঁত বার করে বলল। "এই দুটো নয়া আদমী পুলে মাল বিক্রি করতে এসেছে।"

হাবিলদার বলল, "এখানে ওসব বেআইনি কাজ চলবে না।"

"দুটো টাকা বার করো", ভিক্টর আমাদের দুজনকে আস্তে আস্তে বলল। "ওটা দিলে তোমরা একমাস দাদর পুলে মাল বেচতে পারবে।"

"আমরা যদি না দিই?" ভগবান জিজ্ঞেস করলেন।

"তাহলে পুলে মাল বিক্রি করা বেআইনি হয়ে যাবে।"

"হুঁ..." বলে ভগবান কিছুক্ষণ কি ভাবলেন। তারপর পকেট থেকে দুটো টাকা বার করে ভিক্টরকে দিলেন। ভিক্টর হাবিলদারকে এক কোণে টেনে নিয়ে গেল।

একটু পরে হাবিলদার চলে গেল। ছেলেগুলো নিজের নিজের দোকানের সামনে চলে গিয়ে মাল বিক্রি করতে লেগে গেল। আরো দেড় ঘণ্টা কেটে গেল। ভগবানের একটা বইও বিক্রি হলো না। লোকে রুমাল কিনছে, পেয়ারা কিনছে, ফাউণ্টেন পেন কিনছে, মোজা কিনছে, ওড়না, হেয়ার পিন, রিবন কিনছে। কিন্তু কেউ বাচ্চাদের বই কিনছে না।

"এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার!" ভগবান অত্যন্ত হতাশ হয়ে বললো, "আমি ভেবেছিলাম বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মা-বাবারা তাদের জন্য এইসব সুন্দর সুন্দর গল্পের বই কিনে নিয়ে যাবে কিন্তু···"

"তাদের কাছে ছেলে মেয়েদের স্কুলের বই কেনার পয়সা নেই, তারা তোমার গল্পের বই কিনবে কোথা থেকে?," আমি বললাম।

ভগবান আমার কথার কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সিঁড়ির নিচে হৈ হল্লা শুরু হয়ে গেল। দেখি বেশ একটা লম্বা স্বাস্থ্যবান লোক নবাবী চালে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছে। লোকটার পরনে চুস্ত পাজামা, গোল গলাওয়ালা কমলালেবু রং-এর গেঞ্জি, গলায় একটা কালো তাবিজ বাঁধা। খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে লোকটা। ওকে দেখে ভিখিরীগুলো মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়াল। অনেকেই নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কি সব বলতে লেগে গেল। ও যখন ওপরে উঠে এলো, তখন দেখলাম রুমাল বিক্রেতা ছেলেটা তার বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে ওকে স্যালুট দিল। ভিকটর, শরীফ, গোরখা—এরা সবাই দিল। কেবল আমরা দুজনে আমাদের মালের পাশে বসে রইলাম। ও আমাদের দুজনের দিকে গভীর চোখে তাকাল। ভগবানের বইয়ের ট্রের ওপর বুগের আগা রেখে এক ঠেলা দিয়ে ভিকটরকে জিজ্ঞেস করল, "এই ছোকরা দুটো এখানে কোথা থেকে এলো?"

ভিক্টর বলল, "দাদা···এরা···লাইনে নতুন। আজ থেকে এখানে কারবার করবে, হাবিলদার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে।"

মস্তানটা হাবিলদারের সম্বন্ধে বেশ কয়েকটা চোখা চোখা গালাগাল দিল, তারপর বলল, "এদের বলে দাও, আমাকে রোজ চার আনা করে দিলে তবে এই পুলে বসতে পারবে।"

"কিন্তু হাবিলদার তো আমাদের অনুমতি দিয়ে দিয়েছে।" ভগবান রাগের সঙ্গে বললেন, "হাবিলদার যদি আমাদের এখানে মাল বিক্রি করার অনুমতি দেন তাহলে তুমি বাধা দেবার কে হে?"

"আমি কে?" মস্তান দাদার রাগ চড়ে গেল। গেঞ্জির হাতা গুটিয়ে আবার বলল, "আমি কে? তাই না!" বলেই ভগবানের কাঠের ট্রেটা তুলে পুলের নিচে ফেলে দিল। বইগুলো পাখা ঝাপটানো মুরগির মতো ফড় ফড় করতে করতে নিচে রেল লাইনের ওপর পড়ে গেল। বইয়ের ট্রে ফেলে দেবার পরই পেয়ারার ঝাঁকাটা নিচে ফেলে দিল। এ সময় কল্যাণ লোকাল বেরিয়ে গেল। কোথা থেকে একগাদা বাচ্চা ছেলে জুটে গেল। ওরা রেল লাইনের ওপর পড়ে থাকা

পেয়ারাগুলো তুলে খেতে লাগল। একটা বই ও ছুঁলো না কেউ।

ভগবানের চোখে জল। ভিক্টর ওঁর কানে কানে বলল, "এই এ পুলের মস্তান, মনে করে পুলের মালিক আর কি। ওর অনুমতি ছাড়া কেউ এ পুলে বসতেই পারবে না। ওর কাছে ক্ষমা চাও। আর প্রতিদিন চার আনা করে ভাতা দেবার কথা পাকা করে নাও। নইলে ও তোমাদের সঙ্গে রোজই ঝামেলা করবে।"

"আমি কেন তোলা দেব ? আমি দেব না।" ভগবান দৃঢ় স্বরে বললেন, "আমি কখনোই ওকে তোলা দেব না, আর এই পুলে বসেই আমি মাল বিক্রি করব।"

মস্তানটা দাঁতে দাঁত পিসতে পিসতে ভগবানের গলা চেপে ধরে পকেট থেকে ধারালো ছুরি বার করল। আমি পেছন থেকে মস্তানটার পায়ে কামড় বসালাম, ও ঘুরে দাঁড়াতেই আমরা দুজনে দাদার পুলের সিঁড়ি দিয়ে নিচে পালাতে লাগলাম। বেশ খনিকটা পথ ও আমাদের দুজনকে তাড়া করে এল। আমরা দৌড়তে দৌড়তে রঞ্জিত স্টুডিয়োর ভেতর ঢুকে পড়লাম। রঞ্জিত স্টুডিও অন্য মস্তানের এলাকার মধ্যে পড়ে। তাই ঐ মস্তানটা আর আমাদের ধরার চেষ্টা করল না। আমাদের গালাগাল দিতে দিতে চলে গেল।

আধ ঘণ্টা সময় ধরে আমরা স্টুডিয়োর আর্ট ডিপার্টমেন্টের তিন মাথাওলা বিষ্ণু মূর্তির পেছনে লুকিয়ে রইলাম। আশে পাশে লোকজনের হাঁটা চলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের দুজনের ধরে যেন প্রাণ এলো। আমরা আস্তে আস্তে ডিপার্টমেন্টের বাইরে এলাম। তখন লাঞ্চের সময়। সবাই ক্যান্টিনে চলে গেছে। আর্ট ডিপার্টমেন্ট তাই একদম ফাঁকা।

ব্রহ্মার তিন মাথাওলা মূর্তি দেখে ভগবান বললেন, "এই তিন মাথাওলা মূর্তিটা ব্রহ্মার না ?"

"হ্যাঁ।"

"এখানে কি এঁর পুজো করা হয়।"

"না মহারাজ, ফিল্ম স্টুডিয়োয় নগদ নারায়ণ ছাড়া অন্য কারুর পুজো করা হয় না। ইনি তো মাটির ব্রহ্মা। সেটে রাখা হবে। কাজ ফুরিয়ে গেলে ওঁকে ভেঙে ফেলে ঐ মাটি দিয়েই আবার রাবণের মূর্তি তৈরি করা হবে।"

"হুঁ"···ভগবান কিছু একটা কথা মনে পড়ায় হাসতে লাগলেন।

"কি হলো, হাসছেন কেন ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ভগবান বললেন, "আমি যখন এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করি তখন ব্রহ্মা তাঁর শরীরের জন্য আমার কাছ থেকে একটা মাথার জায়গায় তিনটে মাথা চান। আমি তখন

ওঁর এই দাবিতে বিস্মিত হয়ে বলিলাম, "ব্রহ্মাজী আপনি তিনটে মাথা নিয়ে কি করবেন ?" কিন্তু ব্রহ্মা তাঁর দাবীতে অনড় থাকেন। বলেন, "আপনি দিয়ে দিন না, আপনার তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না।"

"যাইহোক আমি শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মাকে তিনটি মাথা দিয়ে দিলাম। তখন ব্রহ্মার জেদের যৌক্তিকতা আমি উপলব্ধি করতে পারিনি। কিন্তু আজ দাদার পুলের ওপর গুণ্ডাটা যখন আমার গলা চেপে ধরল, তখন উপলব্ধি করলাম, দাদার পুল এলাকায় কাজ করতে হলে প্রত্যেক মানুষের একটার জায়গায় চারটে করে মাথা থাকা দরকার। এখন বুঝতে পারছি ব্রহ্মা অন্যায় দাবি করেন নি", মুচকি হেসে ভগবান বললেন।

"ভুল বলেছেন, কি ঠিক বলেছেন তা আমি জানি না। ও সব বড় লোকদের ব্যাপার, বড় লোকেরা বুঝুক। আমি এটুকু বেশ ভালো করে বুঝেছি যে, এই পৃথিবীতে একটা মাথা বাঁচানই এখন দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনটে মাথা থাকলে তিনটে মুখ হবে। তিনটে মুখে রুটি যোগাবার ক্ষমতা আমাদের কোথায় ?

রুটির কথা মুখে আনতে আমার আবার খিদে পেয়ে গেল।

"হুঁ··· তোমার তো কেবল খিদে লেগেই আছে দেখছি।" ভগবান বিদ্রুপ করে বললেন।

"আপনার খিদে পায় না।"

"না আমার কখনো খিদে পায় না, তবে হ্যাঁ মাঝে মাঝে আমার মাথায় ব্যথা করে", ভগবান উদাস হয়ে বললেন।

"কখন ব্যথা হয় ?"

"হয়, যখন কোন নায়িকা ছম ছম করে চলে যায়, যখন কোন শিশু তার মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যখন কোন ফুল পূর্ণ বিকশিত হবার আগেই শুকিয়ে যায়, তখন আমার মাথায় ব্যথা করে।"

"ব্যথা মাথায় হয়, না হৃদয়ে ?"

"মাথায়, কারণ আমার হৃদয় নেই। মাথা আমি যদিও দেবতাদেরও দিয়েছি, তবু মানুষদেরই কেবল আমি হৃদয় দিয়েছি, কারণ মানুষই কেবল পাপ করতে পারে।"

বিভ্রান্তের মতো আমি ভগবানকে দেখতে লাগলাম। কিন্তু ওঁর মুখের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম না। কোন চিন্তা-ভাবনার লেশ মাত্র নেই। কেবল নিষ্পাপ শিশুর অপাপবিদ্ধতার ছাপ। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমাদের

পায়ের সামনে মাটিতে পড়ে থাকা গনেশের মূর্তি শুঁড় ওপরে তুলে আবার ভগবানের পায়ের সামনে মাথা নিচু করে পড়ে গেল। এই ঘটনায় চমকে গিয়ে ভগবান আমার দিকে তাকালেন এবং মুচকি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "চলো, তুমি তো খিদে পেয়েছে বলছিলে।"
"মানুষের খিদে কি কেউ কখনো মিটাতে পেরেছে?"
রঞ্জিত স্টুডিয়োর ক্যান্টিনে আমি প্রথমে কোকাকোলা খেলাম। তারপর ডাল-ফ্রাই, চিকেন ফ্রাই, বিরিয়ানি ফ্রাই এবং ক্ষীর মালাইয়ের অর্ডার দিলাম। কিন্তু ভগবান আবার নিজের জন্য অ্যাস্প্রোর অর্ডার দিলেন। ভগবান অ্যাস্প্রো খেলেন এবং আমি বেশ দ্রুত করে পেট ভরে খেয়ে গেলাম। বিলের টাকা মেটাবার সময় ভগবানকে তাঁর থলি থেকে একশো টাকার নোট বার করতে দেখে এক বেঁটে ফিল্মষ্টারের চোখ চকচক করে উঠল।
এই বেঁটে ফিল্মষ্টারটার নাম টিঙ্কু, ও ফিল্মে বাচ্চা বা মাঝ বয়সী ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করে। অবশ্য ওর বয়স চল্লিশ বছর এবং হাসির রোলে খুব ভালো অভিনয় করে। ইদানিং ওর অবস্থা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। যে রকম লোভীর দৃষ্টিতে ও আমার সামনে রাখা খাবার ভর্তি প্লেটের দিকে তাকিয়ে-ছিল তার থেকেই আমি ওর অবস্থা বেশ অনুমান করতে পারছিলাম। তাছাড়া দাদারের চার মাথার মোড়ে জলের দোকানে ওর সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হতো। মাঝে মাঝে আমার কাছ থেকে দু চার আনা পয়সা ধার নিতো। অবশ্য যখন ধার দেবার মতো অবস্থায় থাকতাম, তখনই দিতাম।
টিঙ্কুর মুখে দাড়ি গোঁফ কিছু নেই। একেবারে সরল, নিষ্পাপ মানুষের মতো মুখ। মাথায় ও আমাদের দুজনের থেকে এক ফুট খাটো। টিঙ্কু ভগবানকে দেখে মুচকি হেসে আমাদের দুজনের পাশে এসে বসল।
"তোমরা ফিল্মে নতুন এসেছ?" টিঙ্কু আমাকে চিকেনের প্লেট চেটে-পুটে সাফ করতে দেখে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে ভগবানকে বলল। অবশ্য ভগবানের সঙ্গে কথা বলার সময় ও এক চোখ দিয়ে আমাকে দেখছিল আর এক চোখ দিয়ে ভগবানকে দেখছিল।
ভগবান বললেন, "হ্যাঁ, আজই এসেছি।"
"ফিল্মে কাজ করার ইচ্ছে আছে?"
"হ্যাঁ, ইচ্ছে তো আছে, যদি পেয়ে যাই।"
"তোমার মা বাবা কোথায় থাকেন?"

"আমার মা বাবা নেই।" ভগবান উদাসভাবে বললেন।

টিঙ্কু গিয়ে ভগবানের গা ঘেষে বসে একটা হাত ভগবানের কাঁধে তুলে দিয়ে আমার দিকে ইশারা করে বলল, "এ কি তোমার ছোট ভাই ?"

"না, বন্ধু", ভগবান বললেন।

টিঙ্কু সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাল। যেন বন্ধু নয়, আমাকে ও জোচ্চর ঠাউরেছে। আমিও ওর দিকে ঘৃণার চোখে তাকালাম। টিঙ্কু জিজ্ঞেস করল, "ও-ওকি ফিল্মে কাজ করবে বলে তোমার সাথে এসেছে ?"

"আমি জানি না, ওকে জিজ্ঞেস করো," ভগবান বললেন।

"জিজ্ঞেস করার কি দরকার ?" টিঙ্কু অত্যন্ত ঘৃণার চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ও জিন্দেগীতে কখনো ফিল্মষ্টার হতে পারবে না।"

"আর আমার মুখ দেখে কি মনে হয় ?" ভগবান জিজ্ঞেস করলেন।

"তোমার মুখটা বেশ কচি কচি। তোমার মুখটাই এমন যে অনেক বড় বড় অভিনেতা তোমার পায়ের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে যাবে। তোমার মুখ, হ্যাঁ—সত্যিই একখানা মুখ বটে।"

"আমার মুখটা আর মুখ নয়, পাখির ঠোঁট, তাই না!" আমি রেগে গিয়ে বললাম। টিঙ্কু এখন আমাকে চিনতে পারছে না। কেন না এখন আমি একটা বাচ্চার রূপ ধারণ করে আছি। চিনতে পারলে ওকে ঠিক ঠাণ্ডা করে দিতাম। অবশ্য টিঙ্কু আমার কথা না শোনার ভান করে ভগবানকে বলল, "তোমার নাম কি ?"

"ভগবান।"

"তোমার বয়স কতো ?"

"আমি ঠিক জানি না।"

"আমার সম বয়সী বলে মনে হচ্ছে। খুব বেশি হলে বারো বছর বয়স হবে তোমার ?"

"তোমারও কি বারো বছর বয়স," ভগবান টিঙ্কুকে জিজ্ঞাসা করলেন।

"সামনের বড় দিনে বারো বছর বয়স হয়ে যাবে।" টিঙ্কু অত্যন্ত চাপা স্বরে বলল।

তারপর ও বেশ অনুরাগ ভরে ভগবানের কাঁধে হাত রেখে বলল, "আজ থেকে আমি তাহলে তোমার বড় ভাইয়ের মতো। আমার নাম টিঙ্কু। এই ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রিতে আমি কাজ করছি তা আজ প্রায় তিরিশ বছর, মানে তিন বছর ধরে।

কিন্তু অভিনেতাদের মধ্যে আমার স্থান সবার ওপরে। কিন্তু আমি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি নিকট ভবিষ্যতে তুমি যে পোজিশনে পৌঁছবে, সেখানে আমি কোনদিন পৌঁছতে পারব না। তোমার চোখ দেখে আমি একটা বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত পাচ্ছি।"

"কিসের ইঙ্গিত।"

টিঙ্কু আস্তে আস্তে ভগবানকে বলল, "তুমি আমার কথা মতো চললে, আমি তোমাকে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে সব থেকে বড় অভিনেতা করে দেব, সব থেকে বড় চাইল্ড ষ্টার। তুমি জানো দেজি মকরানির একটা ছবিতে কাজ করলে কি পাওয়া যায়?"

কৌতুহলী ভগবান জানতে চাইলেন, "কি পাওয়া যায়?"

"তিরিশ হাজার টাকা।"

"তিরিশ হাজার! না, না, এ অসম্ভব।" ভগবান প্রায় চিৎকার করে উঠে বললেন, "দশ বছরের একটা ছেলেকে এতো টাকা দেওয়া হয়।"

"আর ফিল্ম ষ্টার সোমা কতো পায় জানো? ওর বয়স মাত্র আট বছর……মাত্র আট বছর। এক একটা ফিল্মে কাজ করে ও কতো পায় জানো?"

ভগবান মাথা নাড়িয়ে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

"চল্লিশ হাজার।"

"চল্লিশ হাজার।"

টিঙ্কু বলল, "আজ থেকে পনেরো বছর আগে, তার মানে হলো কি আজ থেকে পাচ বছর আগে, মানে পাঁচ মাস আগে আর কি, আমিই ওকে প্রথম ফিল্মে কাজ পাইয়ে দিয়েছিলাম।"

"চল্লিশ হাজার!" ভগবান বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "আর আমি বেরোবার সময় ওরা আমাকে মাত্র একশো টাকা দিয়েছে। আজ পর্যন্ত আমি একসঙ্গে একশো টাকার বেশি চোখেও দেখিনি।"

"তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমার সঙ্গে ফিল্ম ডিরেক্টরের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি", টিঙ্কু টানতে টানতে নিয়ে চলল ভগবানকে।

"আরে ভগবান কোথায় যাচ্ছেন, কোথায় যাচ্ছেন", আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

ভগবান বললেন, "ফিল্মস্টার হতে।" তাঁর গলার স্বরে তীব্র উৎসাহের স্পষ্ট ছাপ, "তুমি এখানে বসো,"। আমি ওঁর পেছন পেছন যাচ্ছি দেখে উনি আমাকে বললেন, "আমি এখনই ফিল্মষ্টার হয়ে আসছি।"

আমি রাগে দাঁত পিসতে পিসতে ক্যান্টিনে একা বসে রইলাম।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে উনি ফিরে এলেন। উনি একাই এলেন। ওঁর সঙ্গে টিঙ্কু নেই।

"টিঙ্কু কোথায়?" ভগবানকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"ও ওখানেই থেকে গেল। বলল—আজ সন্ধেবেলা হিন্দমাতা সিনেমার পাশে আমার সঙ্গে দেখা করো।"

"আচ্ছা একটা কথা বল তো, ও তোমাকে কোথায় নিয়ে গেল? আর কি কি হলো সেখানে?"

ভগবানকে বেশ খুশি খুশি লাগছিল। মুখের ওপর হাসি লেগেছিল।

"এবার আমি কিছুদিনের মধ্যেই ফিল্মষ্টার হয়ে যাবো। স্বর্গে ফিরে যাওয়ার আর দরকার কি আমার। বুঝলে, আমি আর স্বর্গে ফিরে যাবো না। সামনের সপ্তায় আমি এখানে একটা ফিল্মে কাজ করছি। প্রথম ছবিতেই ওরা আমার তিরিশ হাজার টাকা দেবে। ঘুরে বেরানোর জন্য দেবে বিদেশী গাড়ি। একটা এয়ার কণ্ডিশণ্ড ফ্ল্যাটও দেবে ওরা। এর পরও যদি আমি স্বর্গে যেতে চাই তাহলে আমার মত বোকা আর কেউ নেই। এমন সব সুখ সুবিধে এখানে পাবো যা স্বর্গেও পাওয়া যায় না। প্রত্যেকটা খবরের কাগজে আমার নাম ছাপা হবে।"

"সব কাজে তোমার নাম তো সবার আগেই নেওয়া হয়। তোমাকে বাদ দিয়ে তো কিছু হয় না।"

"কিন্তু খবরের কাগজে তো আর নাম ছাপা হয় না। তুমি একবার বল তো দেখি কোন খবরের কাগজে নাম ছাপা হয়েছে আমার। মানুষ মন্দিরে মসজিদে, গির্জায়, গুরুদ্বারে আমার নাম স্মরণ করে, কিন্তু খবরের কাগজে তো আমাকে নিয়ে লেখে না। কোন আড্ডাখানায় তো আমাকে নিয়ে চর্চা হয় না। নাইট ক্লাবেও হয় না, হোটেলেও হয় না। কোন আনন্দ মুহূর্তে আমার নাম উচ্চারণ করে না। কিন্তু এবার থেকে মুভি ফেয়ারে আমার ছবি পুজো করা হবে। আমি নিরূপা রায়ের সঙ্গে কাজ করব। আর জান তো ঐ ছবিতে অশোককুমার, প্রাণ আছে।"

ভগবান প্রায় খুশিতে নাচতে লাগলেন।

"পাগল হয়েছ তুমি" আমি ভগবানকে বোঝাতে গিয়ে বললাম, "তাহলে দুনিয়া চালাবে কে?"

"তোমার এ দুনিয়াকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দাও।" ভগবান বিরক্ত প্রকাশ করে

বললেন, "দুনিয়ার নাম শুনলেই আমার মাথা ব্যথা করে।"
বিরক্ত হয়ে আমি আবার একটা কোকাকোলা খেলাম। ওঁকে বললাম, "যাইহোক এসব কথা এতো তাড়াতাড়ি পাকা হয়ে গেল কি করে।"
"আমার মুখ, আমার এই নিষ্পাপ মুখ দেখে এই কথা পাকা হয়ে গেল," ভগবান আমাকে বুঝিয়ে বললেন, "টিঙ্কু খুব ভালো ছেলে। প্রথমে ও আমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের কাছে নিয়ে গেল। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে আমার বিস্তারিত কাহিনী শুনে যখন বুঝতে পারলেন আমার মা বাবা কেউ নেই এবং আমি ফিল্মে কাজ করতে চাই, তখন আমার প্রতি ওঁর অত্যন্ত দয়া হলো। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে দুটো টাকা হবে? আমি বললাম, হবে। উনি বললেন, আমাকে দাও তো। আজ ডিরেক্টর লাঞ্চের টাকা দেয়নি। কাল তোমাকে দিয়ে দেব। আমার হাতে একটা খুব ভালো ছবি আছে। ওতে তুমি চাইল্ড ষ্টার হতে পারো। আমি এখনই তোমার সঙ্গে ডিরেক্টরের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। যাই হোক, আমি ওকে দুটো টাকা দিয়ে দিলাম।"
"দুটো টাকা দিয়ে দিলে?" আমি কৌতূহল প্রকাশ করলাম।
"হ্যাঁ, আর ও আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ম ডিরেক্টরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে বলে নিয়ে গেল। ফিল্ম ডিরেক্টর তখন শট নিতে ব্যস্ত। তবে টিঙ্কু এবং ঐ অ্যাসিসট্যান্ট ফিল্ম ডিরেক্টর যখন ওকে গিয়ে বলল, একটা খুব সুন্দর বাচ্চা ছেলে ফিল্মে কাজ করতে চায়, তখন ও দৌড়ে দৌড়ে আমার কাছে এলো এবং আমার বিস্তারিত কাহিনী শুনে ও যখন জানতে পারল আমার মা-বাবা নেই, তখন আমার প্রতি ওর খুব দয়া হলো। আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার পকেটে দশটা টাকা হবে? আমি বললাম, হবে। ও বলল, আমাকে দাও তো। আজ প্রডিউসার আমাকে চেক দেয়নি। কাল পেলেই তোমাকে ফিরিয়ে দেব। আর তুমি আমার পরের ছবিতে আমার সঙ্গে কাজ করছ এটা ধরে নাও। যাইহোক আমি ওকে দশটা টাকা দিয়ে দিলাম। কথা হয়ে গেল ওর সামনের ছবিতে আমি ওর সঙ্গে কাজ করছি। তারপর টিঙ্কু আমাকে ফিল্ম প্রডিউসারের কাছে নিয়ে গেল। কলকাতা থেকে তার তখন ট্রাঙ্কল আসার কথা। কিন্তু আমি এসেছি, এ খবর পাওয়া মাত্রই সে আমার কাছে চলে এলো। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সে আমাকে পাশে বসিয়ে আমার বিস্তারিত কাহিনী শুনল। আমার মা বাবা নেই জেনে আমার প্রতি ওর অত্যন্ত দয়া হলো। ওর চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। ধরা গলায় বলল, তোমার কাছে পঁচিশটা টাকা হবে। আমি

বললাম, হবে। ও বলল, আমাকে তাহলে দাও। আজ ডিস্ট্রিবিউটরের আমার চেক আনার কথা ছিল। কিন্তু আনেনি। কাল এসে যাবে। কাল ও এলেই তোমার পঁচিশ টাকা ফিরিয়ে দেব। তোমার সঙ্গে তিরিশ হাজার টাকার কনট্রাক্টও করিয়ে নেব। যাই হোক, আমি ওকে পঁচিশটা টাকা দিয়ে দিলাম। অশোক কুমার, প্রাণ, নিরূপা রায়ের সঙ্গে আমিও অভিনয় করছি।"
ভগবান অত্যন্ত নিশ্চয়তার সঙ্গে এসব বলে চুপ করে গেলেন। ওঁর নিষ্পাপ মুখে-চোখে আনন্দের ঝলকানি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে দেখলাম।
কপাল চাপড়াতে লাগলাম আমি। তারপর ওঁকে বললাম, "টিঙ্কু তোমার কাছ থেকে কিছু নেয়নি ?"
"না, মাত্র পাঁচটা টাকা নিয়েছে ও। তবে কাল ফিরিয়ে দেবে বলেছে। আজ সন্ধেবেলা হিন্দমাতা হলে ওর সঙ্গে আমার দেখা করার কথা। ওখান থেকে ও আমাকে এক নতুন ফিল্ম কোম্পানীতে নিয়ে যাবে। টিঙ্কু ছেলেটা খুব ভালো।
"টিঙ্কু ছেলে নয়," রাগে আমি প্রায় চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললাম। "ও একটা বামন, ওর বয়স চল্লিশ বছর। ফিল্মে বাচ্চাদের ভূমিকায় অভিনয় করে ও। তুমি একটা মহা মূর্খ।"
ভগবানের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। ওঁর শিশুর মতো অবোধ মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন দয়া হলো। মিছিমিছি লোকটাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখ হলো। আমি ওঁর হাত ধরে বললাম, "আচ্ছা যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। চলো এবার এখান থেকে পালিয়ে চলো। আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে তোমার তবিল ফাঁকা হয়ে যাবে।"
সন্ধে পাঁচটার সময় আমরা হিন্দমাতা সিনেমার পাশে পুরো দু ঘণ্টা টিঙ্কুর জন্য অপেক্ষা করলাম, কিন্তু টিঙ্কু এলো না।
রাত্তিরে বস্তিতে মেঝের ওপর চাটাই পেতে আমরা পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম। বস্তিতে ফিরে গিয়ে আমরা আবার শিশু থেকে পুরোনো রূপে ফিরে গিয়েছিলাম। ভগবান তাঁর হাত দুটো মাথার নিচে বালিশের মতো করে রেখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ঘরে বেশ গুমোট গরম, আমি আমার ছেঁড়া গেঞ্জি খুলে ফেলেছি।
"এখানে তো দেখছি বেশ গরম। তোমার ঘরে তো আলোও নেই।"
"তিন মাসের ভাড়া বাকি। তাই বিদ্যুতের কানেকশান কেটে দিয়েছে, আর বোম্বাইয়ে পাখা না থাকলে গরম লাগবেই।"
"হ্যাঁ আমার তো বেশ গরম লাগছে।" স্বর্গে থেকে থেকে অভ্যেস খুব খারাপ

হয়ে গেছে।

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব?", ভয়ে ভয়ে আমি বললাম

"জিজ্ঞেস করো।"

"স্বর্গের কি কোনো অস্তিত্ব আছে।"

"আছে।"

"আর নরক।"

"নরকও আছে।"

"ভালো?"

"ভালোও আছে।"

"মন্দ?"

"মন্দও আছে।"

"ভালো মন্দ দুয়েরই ফল পাওয়া যায়?"

"হ্যাঁ।"

"তাই তুমি ভালো মানুষদের স্বর্গে পাঠাও এবং মন্দ মানুষদের নরকে পাঠাও?"

"হ্যাঁ।"

"যাদের মস্তিষ্কে ভালোর স্থান নেই, যাদের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন, যাদের হাত রক্ত-মাখা, যাদের চোখের দৃষ্টিতে ক্রোধ, প্রতি পদে যাদের সম্মান ভূলুন্ঠিত হয়, তাদেরই তো স্বর্গে স্থান হওয়া উচিত। কেননা কেবল অন্ধকারেরই আলোর দরকার হয়। যে হাত রক্তে রাঙা, সে হাতকেই কেবল ক্ষমা করা যেতে পারে। কিন্তু যারা ভালো, সুন্দর, যাদের জীবন পবিত্র, হৃদয় নির্মল, কখনো সম্মানহানি ঘটে না তাদের তুমি স্বর্গে আর যারা আগে থাকতেই ঘৃণা ও অন্যায়ের আগুনে জ্বলে মরেছে, তাদের নরকে পাঠাও কেন? তার মানে তুমি স্বর্গকে স্বর্গে এবং নরককে নরকে পাঠাও। এই ধরনের কাজের মাধ্যমে কি তোমার লক্ষ্য পূরণ হয়?"

"কি চাও তুমি?" ভগবান ভেবে বললেন। ওঁর হাত দুটো মাথার নিচে এবং চোখ ছাদের দিকে।

"আমি চাই, তুমি মাঝে মাঝে খারাপ মানুষদেরকে স্বর্গে এবং ভালো মানুষদের নরকে পাঠাও। প্রত্যেকেরই এটা জানা দরকার যে সে কি হারিয়েছে। যে পাপের ক্ষমা নেই এবং যে সততার মধ্যে বেদনা নেই, তার মধ্যে মজা কোথায়?"

ভগবান হাসতে হাসতে বললেন, "তুমি হয়তো চাইছ এই অন্ধকার ঘুপসি

ঘরে ইলেট্রিক আলো আসুক, পাখা চলুক। কিন্তু মিটার, তা পেড়ে গেলে তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে। আমি সৃষ্টি করে দিয়েছি। পরিবর্তন ঘটানো মানুষের দায়িত্ব।

"পরিবর্তন ঘটান খুব কঠিন কাজ," আমি বললাম।

"আমি সব জানি, সে জন্তই এ কাজের দায়িত্ব দেবতাদের না দিয়ে মানুষকে দিয়েছি।"

উনি চুপ করে গেলেন। ঘরের মধ্যে নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। আমার ঘুম আসতে লাগল। ভগবানের কথা আমার কানে আস্তে আস্তে ঢুকছিল। উনি বলছিলেন, "কিন্তু পাপ-পুণ্য, কুফল-সুফলের ওপর জীবনের চাকা ঘোরে। এর স্থান নৈতিকতার ওপরে। এই এখনি এণ্ড্রোমেডানীহারিকার একটি নক্ষত্র ভেঙে পড়ছে। এই মুহূর্তে ছুটি প্রাণীর মৃত্যু হল। একটু আগে পর্যন্ত জীবিত ছিল ওরা। তখন প্রেম করত, ঘৃণা করত, জুলুম করত, দয়া দেখাত—মনের গভীরে আশা গোপন করত। খোলা আকাশ, গাছের সবুজ পাতা, উজ্জ্বল ঠোঁট, হাসি-খুশি চোখ-এর আশা·· কিন্তু এই মুহূর্তেই ঐ নক্ষত্র ভেঙে পড়ছে এবং ছায়া পথের কোন কোন স্থানে জেগে উঠছে নতুন তারা। আগের তারা কি অন্যায় করেছিল যে তাকে মরে যেতে হলো?—এই জন্তই আমি পাপ-পুণ্য ও তার সুফল-কুফল সম্পর্কে কিছু বলিনি। একবার আমি পাপ-পুণ্য এবং তার সুফল কুফল, স্বর্গ ও নরক, আলো ও অন্ধকারকে একত্র করে মানুষ সৃষ্টি করে দিলাম। এখন বালির মধ্যে থেকে স্বর্ণকণা খোঁজা আমার কাজ নয়। এ কথা তো তুমি জানো।"

অনেক দূর ছায়াপথের ওপর থেকে যেন আওয়াজ আসছিল, আর আমি কেবলই বিরক্ত হচ্ছিলাম, কেননা সারাদিনের পর-কর্মক্লান্ত আমি। হঠাৎ মনে হলো কে যেন আমার তলপেটে আঘাত করল সজোরে। চমকে উঠে বসলাম আমি।

ভগবান বললেন, "এই ব্যাটা, এতো তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার কি আছে রে। এখনো তো তেমন রাত হয়নি।',

আমি বললাম, "তুমি তো ভগবান। তোমার তো ঘুম আসে না। আমি গরিব মানুষ—সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত। তাই আমি এখন শুয়ে ঘুমাব। আর একটা কথা, প্রভুর মুখে এমন অশিষ্ট ভাষণ মোটেই ভালো লাগে না।···শালা··· বেটা··· এসব কি কথা! আর যাই হোক তুমি আমাদের ভগবান, আমাদের বস, আমরা তোমার সেবক। সেবকদের সঙ্গে প্রভুর দোস্তি? আমায় ক্ষমা করো, শান্তিতে

একটু ঘুমোতে দাও।"

এ কথা বলে আমি মাদুরের ওপর পাশ ফিরে শুলাম। শুনলাম ভগবান ধীরে ধীরে বলছেন "...হুঁ...আমার জীবনটাই বা কি এমন সুখের—একা, একদম একা...সবাই আমাকে পুজো করে কেউ আমার বন্ধু নয়। এমন কেউ নেই যার কাঁধে হাত রেখে নিসংকোচে তাকে শালা বলে ডাকতে পারি। আদর করে গালি গালাজ করার মতোও যদি কেউ একজন থাকত। ও! কি ভীষণ একা আমি।"

জানি না আরো কতোক্ষণ ধরে উনি ওভাবে বলে গেলেন। ওঁর উদাস তথা মিষ্টি মধুর কণ্ঠস্বরের নেপথ্যে আমি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলাম। ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, বেশ বেলা হয়ে গেছে। জানলার সামনে কড়া রোদ কাঁপছে। আমি হড়বড়িয়ে মাদুর থেকে উঠে দেখি পাশেই এক সুন্দর, নিষ্পাপ শিশু শুয়ে রয়েছে। সাত আট বছর বয়সের একটা বাচ্চা ছেলে। ওর লম্বা চোখের নিমীলিত পাতাগুলো ঘুমের দোলায় আস্তে আস্তে দুলছে।

বোম্বাই শহরের বাচ্চাদের সঙ্গে ভগবানের পরিচয়ের আজ দ্বিতীয় দিন। আজ সকালে মনোহরের সঙ্গে ভগবানের পরিচয় করিয়ে দিলাম। মনোহর একা রোগা পাতলা বখে যাওয়া গুজরাতি ছেলে। কিন্তু ওর কথায় খুব ধার। ওর ক্ষুধার্ত অস্থির চোখ দুটোর দিকে তাকালে মনে হয়, সব সময় যেন শিকারের সন্ধান করছে। দরজার কড়া নাড়িয়ে ভেতরে ঢুকে দুটো বাচ্চাকে সামনে দেখে ও থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

"শেঠ কোথায়?" সে বলল।

কথাটা আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা। কিন্তু আমি তো তখন বাচ্চা ছেলে হয়ে গেছি। তাই ও আমাকে চিনতে পারল না। আমি বললাম, "শেঠ বাইরে গেছে।"

মনোহর আমার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে তুমি শেঠের ছেলে?"

ওর এ কথায় আমি মাথা নাড়ালাম।

মনোহর ভগবানকে দেখিয়ে বলল, "এ কে?"

"একটা ছেলে," আমি চড়া সুরে বললাম।

মনোহর চুপ করে গেল। কয়েক মিনিট ধরে দেখতে লাগল আমাকে। তারপর

বলল, "শেঠ ফিরে এলে বলে দিও চোক্কা এসে গেছে। ওঁর ন টাকা আমার কাছে আছে। সন্ধেবেলা এসে দিয়ে যাবো।"

তারপর আমার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত গম্ভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বলল, "লাগাবে?"

"লাগাব।" আমি বললাম।

"কতো?"

"দু আনা।"

একটা কাগজের টুকরোয় মনোহর নোট করে নিল। ভগবানের কাছ থেকে দু আনা ধার নিয়ে আমি ওকে দিয়ে দিলাম। তারপর মনোহর ভগবানের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "ওকি লাগাবে?"

"কি?" ভগবান জিজ্ঞেস করলেন।'

"নম্বর।" মনোহর বলল।

"নম্বর কি!" ভগবান জিজ্ঞেস করলেন।

মনোহর ঘৃণার সঙ্গে হাসতে লাগল।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "ও কালকেই গ্রাম থেকে এসেছে।"

মনোহর সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের পাশে বসে বোঝাতে লেগে গেল। "এ হলো সাট্টার নম্বর।"

সন্ধেবেলা খেলার রেজাল্ট বেরোবে। তোমার নম্বর মিলে গেলে এক টাকায় ন টাকা পাবে।

"এক টাকায় ন টাকা?" বিস্ময় প্রকাশ করে ভগবান বললেন।

"আমাদের ওখানে তো একটা অপরাধের জন্য একটা শাস্তি এবং একটা ভালো কাজের জন্য একটাই ভালো ফল পাওয়া যায়।"

"এ ভালো কাজ মন্দ কাজ কি বলছে?" বিস্মিত মনোহর আমার কাছে জানতে চাইল।

"ও ওর দেশের সাট্টার কথা বলছে"।

"আচ্ছা? অমন হলে আর সাট্টার মজা রইল কোথায়। এখানে এক টাকা লাগালে ন টাকা পাওয়া যাবে। হাত থেকে যাবে মাত্র এক টাকাই।"

"এ তো বড় মজার খেলা।" ভগবান খুশি হয়ে বললেন, "আমিও তাহলে চার আনা লাগাচ্ছি।"

"কিসে লাগাবে।"

"সভতায়।"

"আবার সেই সভতা। আরে বিয়া নম্বর বল, নম্বর। এক থেকে শূন্য পর্যন্ত কোন একটা নম্বর বলো, আর নাহলে ওপেন লাগাও বা ক্লোজ লাগাও। ওপেন টু ক্লোজ, তাড়াতাড়ি লাগাও। আমার অতো সময় নেই।"

"সময় কখনো ফুরিয়ে যাবার নয়।" ভগবান ধীরে ধীরে বললেন।

মনোহর বলল, "তোমার বন্ধু কিরকম কথা বলে? কোন দেশ থেকে ও এসেছে? সাট্টা লাগাবার হয় লাগাও, নইলে চলে যাচ্ছি আমি।"

"তুমি স্কুলে যাও না?" জিজ্ঞেস করলেন ভগবান।

হাসতে হাসতে মনোহর বলল, "বি. এ পাশ করে লোকে দাদার পোস্ট অফিসের বাইরে বসে চিঠি লিখে দেয়। সারাদিনে দশ আনা পয়সা রোজগার করে। আর এখানে সাট্টা খেলে দিনে দশ টাকা রোজগার হয়। আমি স্কুলে গিয়ে কি করব? তোমার সঙ্গে আমার কাজ চলবে না। ভালো কিছু আমার সয় না।"

মনোহর চলে গেলে ভগবান বললেন, "এই ছেলেটা সাট্টা খেলে! বারো বছর বয়সের ছেলে হয়ে সাট্টা লেখে! সাট্টা তো জুয়া!"

বোম্বাই শহরের তিন চতুর্থাংশ মানুষ সাট্টা খেলে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত জেতার আশাতেই কাটিয়ে দেয়। এই আনন্দটুকু তাদের জীবন থেকে তুমি ছিনিয়ে নিতে চাও?

"কিন্তু ও তো খুব বাচ্চা।"

"বোম্বাই শহরের হাজার হাজার বাচ্চা দিনরাত এই কাজ করে। শহরে এমন কোন রাস্তা, বাজার, গলি ঘুঁজি নেই, যেখানে এইসব বাচ্চাদের পাওয়া যাবে না।"

"ওপেন টু ক্লোজ", ভগবান রাগের সঙ্গে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন।

"মনোহর তার 'ওপেন টু ক্লোজ' ব্যবস্থায় ন টাকা দেবার পথ খোলা রেখেছে, কিন্তু তুমি তোমার ওপেন টু ক্লোজ মানে জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কি দাও?...

"লাথি, ঘুসি, ক্ষুধা, বেকারি, দারিদ্র?" আমি রাগের সঙ্গে বললাম।

"চলো বাইরে যাওয়া যাক," ভগবান বললেন।

মাহিমের খ্রীষ্টান শিশুদের মেলা বসেছে। সেন্ট অ্যাণ্ড্রুজ চার্চের বিশাল কম্পাউণ্ড লোকে পরিপূর্ণ। নানা রং-এর ঝালর টাঙানো রয়েছে। কম্পাউণ্ডের এক কোণে পাথরের খোলা মন্দিরে পবিত্র মরিয়মের মূর্তির সামনে লোকে এসে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। নতুন সুন্দর কাপড় পরা শিশু, পুরুষ, নারীরা গির্জার ভেতরে মোমবাতি নিয়ে যাচ্ছে।

কম্পাউণ্ডের বাইরে ছেলে বুড়ো সবাই নাগরদোলা চড়ছে। লুচি পুরি কিনে খাচ্ছে। যিশুখ্রীষ্টের ছবি কিনছে। গিলটি করা আকর্ষণীয় গয়না, আমেরিকান কাট জিনস, জামা কাপড়, চকলেট, মিঠাই, সস্তা সুগন্ধী, লিপস্টিক, কাগজের ফুল, রেশমী রুমাল—সবই বিক্রি হচ্ছে। সর্বত্র এক মধুর ব্যস্ততা বিরাজ করছে। সেইসঙ্গে রঙের বাহার ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র।

এই দৃশ্য দেখে ভগবান অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। অনেকক্ষণ ধরে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ালেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুগন্ধ ছড়ান শিশু, তাদের মা বাবা, ভাই বোনদের দেখে খুব খুশি হলেন।

বললেন, "সব শিশুর এমন হওয়াই উচিত। পৃথিবীটা এমন হওয়া দরকার। আমাদের ছেলে-মেয়েদের…এমনই সুন্দর·

এদিকে আমার খিদে পেয়েছে। চার প্লেট লুচি খেয়ে ফেললাম। কয়েকটা চকলেট খেলাম, দু পকেটে মিষ্টি ভরে নিলাম। আর ভগবানের আকর্ষনীয় দার্শনিক কথাবার্তা ব্যঙ্গভরে হাসতে হাসতে শুনতে লাগলাম।

"এই পৃথিবীতে ছ বছর বয়সের বাচ্চারও জীবন দর্শন এমন হয় না। কে জানে তুমি কোন দুনিয়ার কথা বলছ ভগবান!"

ভগবান তাঁর সামনের হাজার হাজার সুন্দর সুগন্ধ ওড়ানো শিশুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই সুন্দর, নিষ্পাপ, সরল শিশুদের দেখব বলেই তো আমি স্বর্গ থেকে এসেছি। আমি তো এইসব শিশুদেরই খোঁজ করছিলাম।"

"এখন তুমি এই বাচ্চাদের পেয়ে গেলে। এবার নিশ্চিন্ত মনে স্বর্গে ফিরে যেতে পারো।"

"হ্যাঁ" ভগবান আনন্দের সঙ্গে বললেন।

"তাহলে চলো এবার ফিরে যাওয়া যাক। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। এখন তুমি স্বর্গের দেবতাদের কাছে তোমার সুন্দর রিপোর্ট পেশ করতে পারো।"

"সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।" ভগবান দৃঢ় আত্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সামনের সুন্দর দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আজ সন্ধেবেলাতেই আমি ফিরে যাবো…"

"যাবে তো যাও। আমি তোমাকে যাছিয়ে বাসে তুলে দেব। তোমাকে তো অনেকটা পথ যেতে হবে।"

"চলো", বলে ভগবান আমার সঙ্গে ফিরে চললেন।

কম্পাউণ্ডের বাইরে একটা বাচ্চা ছেলে মোমবাতি বিক্রি করছিল। ও আমাদের পিছু নিল।

"পুওর অরফ্যান···পুওর···পুওর অরফ্যান···দুটো মোমবাতি তিন আনা···তিন আনা দিয়ে দুটো মোমবাতি···যিশুর আশীর্বাদ নিয়ে যাও। যিশু তোমাদের ভালো করবেন···মাদার, ফাদার, ড্যাড···তিন আনাই দাও—"

অনেকটা পথ ও এইভাবে আমাদের পেছন পেছন আসতে লাগল। ওর আবেদন শোনা মাত্রই ভগবান ওর প্রতি সদয় হয়ে উঠেছিলেন। তিন আনা দিয়ে দুটো মোমবাতি সঙ্গে সঙ্গে কিনে ফেলছিলেন। কিন্তু আমি বারণ করায় বাধ্য হয়ে অসহায়ের মতো মাথা নিচু করে যেতে লাগলেন। ছেলেটাও খুব গরিব এবং সরল প্রকৃতির। ওর কাতর আবেদন আমাকেও শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত করে ফেলল। আমি বললাম, "আচ্ছা ঠিক আছে ওর কাছ থেকে মোমবাতি নিয়ে নাও, সেই কখন থেকে কানের কাছে প্যান প্যান করছে।"

ভগবান আমার দিকে ধন্যবাদ দেবার দৃষ্টিতে তাকালেন। ছেলেটার কাছ থেকে তিন আনা পয়সা দিয়ে দুটো মোমবাতি কিনে নিলেন।

"ক্রাইষ্ট সেভ ইওর সোল"। ছেলেটা তিন আনা পয়সা নিয়ে আমাদের দুটি আশীর্বাদ দিল।

"গড ব্লেস ইউ···ক্রাইষ্ট সেভ ইওর সোল···পুওর অরফ্যান···মাদার ফাদার ড্যাড···তিন আনায় দুটো আশীর্বাদ···"

কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়ে আমি ভগবানকে বললাম, "ক্রাইষ্ট সেভ ইওর সোল? তোমার কি সোল আছে? মানে তোমার কি আত্মা আছে?"

ভগবান বললনে, "আরে পাগলা, সুখ দুঃখ—এই দুয়ের সঙ্গেই আমি সম্পর্ক-রহিত। যারা দুঃখ, সুখ, ব্যথা-বেদনার সঙ্গে পরিচিত তাদেরই তো কেবল আত্মা আছে।"

"আনন্দ কি?"

"একটা মনোভাব মাত্র।"

"একটা মনোভাবকে সংরক্ষণের জন্যই মানুষ মোমবাতি জ্বালায়!"

"এই উদ্দেশ্যে মানুষ তো নিজের শরীর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেয়।" ভগবান বললেন, "তুমি তো জানো···"

"হ্যাঁ, তিনি বহুবার তাঁর সিদ্ধান্তকে জ্বলতে দিয়েছেন, গভীর কবর খুঁড়ে তার মধ্যে চাপা দিয়েছেন। রেশমের দড়ি দিয়ে শ্বাস বন্ধ করে মেরেছেন,·· শেষে ক্রসে পেরেক ঠুকে শেষ করে দিতে দিয়েছেন। কিন্তু এতো করেও তাঁকে শেষ করা যায়নি···তবে এ সিদ্ধান্তের মধ্যেও ভুল আছে···" আমি ভেবে বললাম, "একসময় এই সিদ্ধান্তেরও মৃত্যু হয়।···যেমন সেই চরকা কাটা বুড়িটা মরে

গেছে, স্পুটনিক ওকে মেরে ফেলেছে ··সিদ্ধান্ত যদি ভালো হয় তাহলে তাতে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।"

এদিকে বান্দ্রা বাস স্ট্যাণ্ড এসে গেল। আমি আর কিছু ভাবতে পারলাম না। নইলে হতো কি আমার আত্মা ঐ বাসের সঙ্গে চলে যেতো। আমার শরীর বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকত। তাই আমরা দুজনে তাড়াতাড়ি বাসে উঠে বসে পড়লাম। ডবল ডেকার বাস। ওপরের তলায় গিয়ে বসলাম। প্রচুর হাওয়া। চোখের সামনের দৃশ্যও বেশ মনোরম। পাশাপাশি বসলাম আমরা। একটা ছেলে আমাদের ডান দিকের সিটে বসে রয়েছে। ছেলেটা মনে হয় স্কুলে পড়ে, কারণ ওর পরণে বেশ সুন্দর স্কুলের পোষাক। ওর বিশাল চামড়ার ব্যাগটা মনে হয় বইয়ে ঠাসা। কোলের ওপর একটা বই। সামনের পকেট একটা পেন। পরণে সাদা পোশাক, সাদা জুতো। সব মিলিয়ে বেশ মিষ্টি লাগছে ছেলেটাকে। আমরা দুজনে প্রশংসার চোখে ছেলেটাকে দেখতে লাগলাম, কিন্তু আমাদের দিকে মোটেই ওর নজর নেই·।

এমন সময় কনডাকটার এলো। ভগবান টিকিট কাটবেন বলে পকেটে হাত ঢোকালেন তো হাত পকেটেই রয়ে গেল। চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি হলো?"

"কেউ আমার পকেট মেরে দিয়েছে।"

"কখন?"

"জানি না।"

"হাতের মোমবাতির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই মোমবাতি যখন কিনি, তখন তো পকেটে পয়সা ঠিকই ছিল।"

"তারপর তো আমরা হাঁটতে হাঁটতে বাস স্ট্যাণ্ডে এলাম। বাস স্ট্যাণ্ডে আমরা দুজনেই কেবল দাঁড়িয়ে ছিলাম। মনে হচ্ছে এ ঐ পুত্তর অরফ্যানের কাজ ·· মাদার ফাদার ড্যাড·"

আমি হা হা করে হাসতে লাগলাম।

"কিন্তু ওকে দেখে কতো গরিব অসহায় বলে মনে হচ্ছিল। ওর চোখ দিয়ে জল পর্যন্ত গড়াচ্ছে·· কেমন নিষ্পাপ ওর চাউনি," ভগবান বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন।

"চোখে ছিল জল আর হাতে ছিল কাঁচি, নাহলে পকেট কাটবে কি করে?"

"তাড়াতাড়ি পয়সা বার করো"। কনডাকটার অস্থির হয়ে উঠল।

"এই মোমবাতি দুটো নাও, এগুলো জ্বালালে তোমার আত্মা তৃপ্তি পাবে"

ভগবান অনুনয়ের সঙ্গে বললেন।
বাস কনডাকটর বলল, "আত্মার তৃপ্তি হবে বুঝলাম, কিন্তু চাকরি চলে যাবে। আমি এ কাজ করতে পারব না। পয়সা বার করো।"
"আমার কাছে তো পয়সা নেই। তবে তুমি যদি আমাকে টিকিট দাও আমি তোমাকে আশীর্বাদ দেব। গড ব্লেস ইউ…"। ভগবান অত্যন্ত কাতর স্বরে বললেন।
"আরে ছোকরা আমার সঙ্গে মজা করছিস," বাস কনডাকটর রেগে গিয়ে বলল। "এখনই গাড়ি থামিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেব, বার কর পয়সা…তুই ও বার কর," বাস কনডাকটর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "গড ব্লেস ইউ…এটা সরকারের বাস, চার্চের নয়।"
"আমার পয়সাও ওর কাছে ছিল। ওর পকেট মার গেছে। তাই আমিও টিকিট কাটতে পারছি না স্যার," আমি অত্যন্ত করুণ সুরে বললাম।
বাস কনডাকটর রেগে গিয়ে ঘন্টি বাজাল। বাস থেমে গেলে পাশের স্কুলের ছেলেটা বলল, "তোমরা কোথায় যাবে?"
ও ভগবানকে জিজ্ঞেস করল।
ভগবান আমার দিকে তাকালেন।
আমি বললাম, "আমরা বাইকুল্লা ব্রিজ পর্যন্ত যাবো।"
"আমিও ওখানে যাচ্ছি। তোমাদের দুজনের টিকিটের পয়সা দিয়ে দিচ্ছি আমি। তোমরা বাইকুল্লা ব্রিজে নেমে নিজেদের বাড়ি থেকে আমাকে পয়সা দিয়ে দেবে," ছেলেটা বলল।
ভগবান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। আমি ওঁকে চোখ মারলাম। উনি চুপ করে গেলেন। ছেলেটা যখন আমাদের টিকিটের পয়সা দিচ্ছিল তখন বাসটা মাহিম বাসস্টপে এসে দাঁড়িয়ে গেল। একটা পুলিশ দোতলায় উঠে এদিক ওদিক কি খুঁজে গেল। ভগবান জিজ্ঞেস করলেন," ও কি খুঁজছে।"
স্কুলের ছেলেটা বলল, "এখানে মদের জন্য সার্চিং হয়, বোম্বাই শহরে মদ নিষিদ্ধ আছে না…।"
"তুমি কি বোম্বাইয়ে এই প্রথম এলে?" পুলিশটা ভগবানকে জিজ্ঞেস করল।
"হ্যাঁ।"
"তুমি যেখান থেকে এসেছ, সেখানে কি মদ পাওয়া যায়?" পুলিশটা আবার জিজ্ঞেস করল।
"পাওয়া যায়।" ভগবান গর্বের সঙ্গে বললেন, "সেখানে তো মদের নদী বয়ে

গেছে।"
"আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে আমার কাজ করতে দাও।" বলে পুলিশটা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লেগে গেল। ভগবানের শরীর তল্লাশ করল, আমার শরীর তল্লাশ করল। স্কুলের ছেলেটা আমাদের দুজনকে দেখে হাসতে লাগল। পুলিশটাও ওকে দেখে হাসতে লাগল।
একটু পরে পুলিশ চলে গেলে বাসটা ছেড়ে দিল। এবার ঐ ছেলেটা ওর সিট ছেড়ে আমাদের সামনের সিটে এসে বসল। ও ভগবানকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার পকেটে কতো পয়সা ছিল।"
"তা তো ঠিক জানি না। তবে যা ছিল সব গেছে।"
"তবুও একটা অনুমান করে বলো, কতো ছিল।"
"আরে কি করে বলব! যা ছিল সব গেছে, বোম্বাইয়ের জন্য যা এনেছিলাম সব গেছে। এখন একটা পয়সাও আমার কাছে নেই।"
"বোম্বাইয়ে কোথায় থাকো?"
"কোথাও থাকি না। এর কাছে এসেছিলাম। কিন্তু এর কাছেও কোন কাজ নেই।" ভগবান আমার দিকে ইশারা করে বললেন।
ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, "মাষ্টার আমি শহরের গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ান ছেলে। তোমার মতো স্কুলে টুলে যাই না। তুমি যে আমাদের টিকিটের পয়সাটা দিলে মনে কর ওটা গায়েব হয়ে গেল—বাইকুল্লায় আমার নিজের কোন ডেরা নেই, হয় আমাদের ক্ষমা করে দেও, নইলে পুলিশের হাতে তুলে দেও।"
আমার কথা শুনে ছেলেটা মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। পকেট থেকে সাদা রুমাল বার করে গায়ের ঘাম মুছতে লাগল। এ ধরনের কথা ও হয়তো এই প্রথম শুনল। ছেলেটাকে অত্যন্ত ভদ্র ঘরের ছেলে বলেই মনে হলো। আমাদের ওপর সদয় হয়েই ও আমাদের টিকিটটা কেটেছিল। কিন্তু এ ছাড়া আমাদের আর করবারই বা কি আছে…।
বাইকুল্লা ব্রিজের পাশে নেমে ছেলেটা আমাদের বলল।
"তোমরা আমার পয়সা না দিতে পারলে আমার ব্যাগটা বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাও।"
"তোমার বাড়ি পর্যন্ত?" ভগবান জিজ্ঞেস করলেন।
"হ্যাঁ", ছেলেটা বলল। ও ওর ব্যাগটা ভগবানের হাতে তুলে দিল। ভগবান ঐ চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে ছেলেটার পেছন পেছন যেতে লাগলেন। আমি

ভগবানকে অনুসরণ করে হাঁটতে লাগলাম।
ট্রাম লাইন পার করে আমরা একটা গলির ভেতর ঢুকলাম। সেখান থেকে আর একটা গলিতে। তারপর আর একটা গলিতে, সেখান থেকে একটা বাজারে। বাজার পার করে একটা কাঠের ঘরে ঢুকলাম।
সেখানে মাথায় ময়লা টুপি, গায়ে ময়লা গেঞ্জি, পরনে ময়লা লুঙ্গি ধারী একটা ছেলে বসে রয়েছে। ছেলেটার বয়স এই সতের আঠার বছর হবে। ছেলেটার মুখে গালে কালছে সবজে রং। ওর গায়ের রং ময়লা, দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত। মুখে দাগ, হাজার দাগ। ময়লা লুঙ্গির ওপর থেকে পা চুলকোতে চুলকোতে ছেলেটা ঐ সুন্দর পোশাক পরা স্কুলের ছেলেটাকে বলল, "এরা কারা?" আমাদের দিকে ইশারা করল।
"আমার বন্ধু।"
"বিশ্বাসযোগ্য।"
"হ্যাঁ, ওরা গরিব, ওদের কাছে টাকা পয়সা নেই।"
"কাজ করবে?"
ময়লা পোষাক পরা ছেলেটা আমাদের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বলল।
"পেলে কেন করব না।" আমি সঙ্গে সঙ্গে আগ বাড়িয়ে বললাম।
আমার এ কথার উত্তরে ছেলেটা কিছু বলল না। পরিষ্কার পোশাক পরা ছেলে-টিকে বলল, "নিয়ে এসেছ?"
"হ্যাঁ।"
"কোথায়?"
ওর এই প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটা মুখে কিছু বলল না, ব্যাগ খুলতে লাগল। ভগবানের মুখ হাঁ হয়ে গেল।
"আমি তো ভেবেছিলাম তুমি স্কুলে পড়া ছেলে।"
"কে হাকু?" বলে ঐ তুলনায় বয়সে বড় ছেলেটা হা হা করে হাসতে লাগল।" আমার হাকু ভাই তো এখন চুল্লু স্কুলের পড়ুয়া। দশ বছর ধরে এই কাজ করছে। এবার চুল্লু স্কুল পাশ করে হুইস্কি কলেজে ভর্তি হবে।"
"তোমার বাবা কোথায়?" হাকু জিজ্ঞেস করল।
"বাবা খেতে চলে গেছে। আমাকে বলে গেছে, ও এলে ওকে ওর টাকা দিয়ে মাল নিয়ে নিতে, সে শালা আর কতোক্ষণ তোমার অপেক্ষা করবে।"
"টাকা বার করো", হাকু ব্যস্ততার সঙ্গে বলল।
"বার করছি। তার আগে এক এক পেগ করে হয়ে যাক তো···"

ময়লা লুঙ্গি পরা ছেলেটা কাঠের স্তূপের পেছন থেকে চারটে গেলাস বার করল।

ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, "অ্যাঁ, তোমরা মদ খাবে?...তুমি...এই বাচ্চা ছেলে...তুমিও?" ভগবান হাকুর দিকে তাকিয়ে বললেন।

হাকু প্রাণ খুলে হাসতে লাগল।

"আরে এতে কি হয়েছে! মালের ধান্ধা করবে আর মাল খাবে না.. ভয়েরই বা কি আছে। প্রেম করলে ভয় করা চলে · আজকে তোমরাও একটু চেখে দেখ না.."

বড় ছেলেটা চারটে গেলাসে চুল্লু ঢালতে ঢালতে এবং যে বোতল থেকে চুল্লু ঢালছিল তাতে জল মেশাতে মেশাতে বলল, "আমার বাবা জানতে পারবে না... শালা বোতলে জল মিশিয়ে দিলাম। কিন্তু তোমরা আর দেরি করো না, তাড়াতাড়ি গেলাস খালি করে ফেল। বাবা এসে পড়লে আমাকে মেরে শেষ করে দেবে।"

ওরা দুজনে গেলাসে চুমুক মারতে শুরু করল। আমি দেখলাম এই উপযুক্ত সময় সঙ্গে সঙ্গে দুজনে পালাতে শুরু করে দিলাম। ওরা ঘাবড়ে গিয়ে আমাদের পালিয়ে যাওয়া দেখতে লাগল। ওরা অবশ্য আমাদের তাড়া করল না। ওরা হয়তো অত্যন্ত বোকা ভেবেছে আমাদের।

বাইকুল্লা ব্রিজে পৌঁছে আমরা দাদরের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

আমি ভগবানকে বললাম, "এখন কোথায় যাবে?"

"তোমার বাড়িতে।"

"কিন্তু তুমি তো আজ চলে যাবে ঠিক করেছিলে।"

"আমি এখন ও সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছি।".

"হাকুকে দেখে..."

ভগবান কোন উত্তর দিলেন না। আমি দেখলাম ভগবানের চোখে জল।

আমি ভাবলাম ভগবানকে বলি, "তুমি বড় ভালো মানুষ ভগবান। তুমি অত্যন্ত পবিত্র, তোমার সহৃদয়তার তুলনা নেই। কিন্তু যদি চোখের জলে এই দুনিয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারো, তাহলে প্রতিদিন সকালে শিশিরের জলে ভিজিয়ে চোখ খোল কেন?" কিন্তু ওর চোখে জল দেখে আমি কিছু বলতে পারলাম না।

সেদিন রাতে ঘরে বেশ গরম করছিল। একে গরম, তার ওপর আবার খিদেয় একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমি রাগের সঙ্গে ভগবানকে বললাম, "আচ্ছা তুমি আমার কাছে এলে কেন বল তো। এই শহরে বহু কোটিপতি,

লাখপতি ব্যবসায়ী, মিল মালিক, ঠিকাদার বাস করে। ওরা তোমাকে সবরকম ভাবে সাহায্য করত। তাদের কাছে তুমি সবরকম সুযোগ-সুবিধে পেতে, তোমার কোন রকম অসুবিধে হতো না। আমার কাছে আসার তোমার কি দরকার বল তো।"

"আমি ভগবান, যার কাছে ইচ্ছে যেতে পারি।" ভগবান বিরক্তির সঙ্গে বললেন। "তুমি আমার সমালোচনা করার কে হে? ...আমি তোমার কাছে এসেছি বলে তোমার অবশ্যই আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।...উলটে কি না, তুমি ধমকাচ্ছ আমাকে..."

"ধমকাবো নয়তো কি করব, সকাল থেকে খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। শ্রীষ্টানদের মেলায় যা একটু মিষ্টি খেয়েছিলাম। তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত এক কাপ চাও পেটে পড়েনি। সারাদিন তোমার সঙ্গে দুনম্বরী করে বেড়াচ্ছি, তার ওপর আবার তুমি নিজে পকেটমারের কাছে সব খুইয়ে এসেছ।"

"তার মানে তোমার খিদে পেয়েছে।" ভগবান মুচকি হাসতে হাসতে বললেন। আমি ক্ষেপে গিয়ে বললাম, "তোমার মতো ভগবান তো আমি নই, যে আমার খিদে পাবে না।"

ভগবান চুপ করে গেলেন।

আমি বললাম, "চুপ করে গেলে কেন। আমাদের সৃষ্টি করেছ, অথচ আমাদের বাঁচার ব্যবস্থা করোনি কেন? এখন আমাদের চুপড়িতে বসে গরমে পচে মরছ কেন। যাও নিজের স্বর্গে ফিরে যাও, আর আমাদেরকে দুনিয়ার এই ভাটিখানায় পচে মরতে দাও।"

ভগবান বললেন, "আমি তো এখন যেতে পারব না। আমার এখনো কাজ বাকি আছে।"

"তাহলে পয়সা বার করো।" আমি ঝগড়া করার সুরে বললাম।

"তুমি তো জানো আমার কাছে পয়সা নেই। ঐ মোমবাতি দুটো কেবল আছে।"

"মোমে পেট ভরে না ভগবানজী। ভগবানের দিব্বি তুমিও বড় উলটো পালটা কথা বলো।"

"তাহলে কি করব!" ভগবান হার স্বীকার করে বললেন।

"আমি জানি না তুমি কি করবে। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে...তুমি স্বর্গ থেকে টাকা আনাও।"

"ওরা পাঠাবে না।"

"কেন পাঠাবে না, কার আদেশে পাঠাবে না?"

"আমার আদেশেই পাঠাবে না। সমস্ত নিয়ম-কানুন আমিই তৈরি করেছি। এখন আমি নিজে কি করে সেগুলো ভাঙি।"

"তুমি বড় অদ্ভুত তো ভগবান। সমস্ত বোম্বাই শহর থেকে বিরক্ত করার জন্য তুমি কেবল আমাকেই বেছে নিলে। ফিল্মষ্টার তাজকাপুর আছে। চার লাখ টাকা ব্ল্যাকে নেয়। পঁচিশ হাজার টাকার কনট্রাকট করে। চমৎকার তার বাংলো বাড়ি। তুমি তার কাছে গেলে না কেন?"

"আমি একবার ওর হৃদয়ের গন্ধ পাবার চেষ্টা করেছিলাম," ভগবান বললেন, "কিন্তু আমি ওঁর হৃদয় থেকে কোন সুগন্ধ পাইনি।"

"তাহলে কাপুড়জী দালালওলার কাছে চলে গেলে পারতে ...... । সবাই জানে তিনি মিড্‌ল ইষ্টে সোনা পাচার করেন। বাট টাকা তোলা দরে সোনা কিনে একশো পঁচিশ টাকা তোলা দরে বিক্রি করেন। প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার সোনা স্মাগল করেন। সরকারের বড় বড় ঠিকায় অংশ নেন। কিন্তু মানুষটি বড় দয়ালু, উদার হৃদয়, আর ভগবানভক্ত। এ বছর উনি নিজের পকেটের টাকা খরচ করে দুটো মন্দির, দুটো মসজিদ, দুটো গির্জা এবং দুটো গুরুদ্বার তৈরী করিয়ে দিয়েছেন। তুমি ওঁর কাছে যেতে পারো...... "

ভগবান বললেন, "আমি ওঁর চোখ দেখেছি। ওঁর চোখে লজ্জার চিহ্ন মাত্র নেই।"

"তাহলে তুমি উমা পচকারনির বাড়ি চলে যাও...... ও হলো বোম্বাইয়ের সব-থেকে বড় বেশ্যা এবং বাড়িউলি। ও নিজেই পঞ্চাশটি বেশ্যার মালিক। ঐ সমস্ত বেশ্যার মাধ্যমে এক এক রাতে ওর যা আয় হয় সেটা চিমা-মিল-এর দেড় হাজার শ্রমিকের তিরিশ দিনের মাইনেরও বেশি। দিনে দুবার করে পূজো করে ও। দেবতার চরণে মাথা নিচু করে বেশ কয়েক ঘণ্টা বসে থাকে।"

ভগবান বললেন, "আমি ওর বুকের ওপর ঝুঁকে দেখেছি, সেখানে কোন শিশুর কলরব শুনতে পাইনি।"

"তাহলে তুমি পীর কয়ামত আলির কাছে চলে যাও। ও বোম্বাই শহরের সব থেকে বড় সুফি, সব সময় ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকে।"

"ও দানের ওপর বেঁচে আছে।"

"তাহলে রামু ধোপার কাছে চলে যাও।"

"ও ওর বউকে মারে।"

"তাহলে পাশের ঘরের ক্লার্কের কাছে চলে যাও।"

"ওর নামটা আমার পছন্দ নয়।"

ভগবানের এই কথায় আমার আপনা আপনি হাসি পেয়ে গেল। ভগবানও হাসতে লাগলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমার সমস্ত ক্রোধ নিবে গেল। বললাম, "তুমি তো ভগবান......কিন্তু তোমার মধ্যে রসবোধও আছে...।"

"নিজের সৃষ্টি দেখে যদি কেউ না হাসে, তবে সে ভগবান নয়", ভগবান হাসতে হাসতে বললেন।

"সে তো ঠিক কথা", আমি একটু পরে ভাবনারত অবস্থায় বললাম, "কিন্তু হাসলে পেটের খিদে মরে না, বরং আরো বেড়ে যায়।"

ভগবান বললেন, "আমারও তো খিদে পাচ্ছে।"

"তোমারও? কি করে?" আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম।

"হয়তো তোমাদের পৃথিবীর প্রভাবে।"

আমি বললাম, "আমার এক বন্ধু আছে ধেনু। আজমগড়ের লোক। ধুতি পরে......মাথায় লম্ব টিকি। কিন্তু বেশ মজার মানুষ। দিনের বেলায় দুধ বিক্রি করে। রাতে মদের ধান্ধা করে। ওর কাছে গেলে ও খেতে তো দেবেই, এক আধ পেগ চুমুক মারতেও দিতে পারে। কিন্তু সেখানে যেতে গেলে মাহিম পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে।"

"তাই যাবো।"

"বেশি ধরা ধরি করলে দু-এক পেগ খেতেও হবে।"

"খাবো।"

"আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পুলিশ এসে পড়ে, তাহলে ধরা পড়লে হাজত বাস করতে হতেও পারে।"

"করতে হলে করব...।" ভগবান অত্যন্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে বললেন।

"ভালো করে ভেবে দেখ," আমি বললাম, "পরে আমাকে যেন ধমকিও না, কোথায় আমায় নিয়ে এসে বলে। পরের দিন খবরের কাগজে হয়তো হেডলাইন হলো দেখলে · ভগবান পুলিশ হাজতে।... ভেবে দেখ, তখন তোমার লজ্জা হবে না তো?"

"লজ্জা কেন হবে? বোম্বাই শহরে এই যে এতো মন্দির রয়েছে, সর্বত্র লোহার গেটের মধ্যে আমাকে বন্দী করে রেখেছে... তা এটা বন্দীদশা বা হাজত বাস ছাড়া আবার কি? ..." ভগবান বেশ রুক্ষ মেজাজে ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন।

আমি চুপ করে গেলাম। ঘরের বাইরে বেরিয়ে পায়ে চটি গলালাম।

মাহিমে বছরে যেখানে বছরে দুবার গ্রেট রয়্যাল সার্কাসের সামিয়ানা পড়ে

সেখানেই ধেনুর ঝোপড়ি। ওর আসল বাড়ি গোড়েগাঁও-এর কাছে। সেখানেই চুল্লুর ধান্ধা ঠিক জমবে না। সে জন্য পুলিশ চৌকির একেবারে পাশে ঐ ঝোপড়িতে চুল্লুর ধান্ধা শুরু করেছে। মসজিদের পেছনে ওর মদের কারবার। এখানে ওর ব্যবসা ভালোই চলছে।

অনেক দিন পরে ধেনুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তাই ধেনু আমাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাল। আমার কাছে একটাও পয়সা নেই বুঝতে পেরে ও কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ করল না। কোন প্রসঙ্গের অবতারনা না করেই আমাদের সামনে দু পেগ চুল্লু এগিয়ে দিল। এক প্যাকেট চারমিনার দিল। দু টুকরো মাছ ভেজে দিল। জানি না ভগবানের মুখ দেখে ও কি করে বুঝতে পারল ভগবানও একজন শিশু।...এবং ভগবানের পকেট একদম ফাঁকা।

"ফুর্তি করো," ধেনু আমাকে বলল, "আজ তোমাকে তিন পেগ খাওয়াবো। আবার অন্য খাবারও খাওয়াবো। পয়সা পরে উসুল হয়ে যাবে। .. ভগবানের দয়ায় দুধ আর চুল্লুর ব্যবসা ভালোই চলছে।

একথা বলে ধেনু ওর লম্বা টিকিতে গেঁট মারল। দেওয়ালে টাঙানো ভগবানের ছবির দিকে মাথা নিচু করে নমস্কার করল। তারপর কাজ করতে লেগে গেল। এইসব ঝোপড়িতে শ্রমিক বড়লোকেদের বাড়িতে কাজ করা ঠাকুর চাকর পেশাদার ভিকিরি এবং রাত দশটার পর থেকে মেয়েছের দালালি করা মানুষদের বাস। বিচিত্র সব ভাষা, অদ্ভুত অদ্ভুত সব গালি গালাজ। তার ওপর আবার তামাক, মাছ, ও চুল্লুর গন্ধ মানুষের ঘামের গন্ধের সঙ্গে মিশে এক বিচিত্র দুর্গন্ধের সৃষ্টি করেছে।

"মানুষ তার নিজের বসবাসের জন্য নরকের থেকেও কষ্টকর বস্তি তৈরি করে রেখেছে," ভগবান ধীরে ধীরে ধীরে বললেন। ওঁর গলার স্বরে ঘৃণা।

"তাহলে তো তুমি মানবে, কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি।"

"মানছি।"

"তাহলে তুমি এ কথাও নিশ্চয়ই মানবে, মানুষ চেষ্টা করলে স্বর্গের থেকেও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।"

"তুমি..."ভগবান মুচকি হেসে বললেন, "চুল্লু খাও..."

এখানে এক দালাল আর এক দালালের সঙ্গে কথা বলছে দেখলাম,—তারপর আমি ওকে বাঁধানো দাঁতওয়ালা মেয়েটার কাছে নিয়ে গেলাম। মেয়েটা সবে মাত্র তার ডেনটিষ্টের কাছে দাঁত লাগিয়েছে। কিন্তু খদ্দেরটার বাঁধান দাঁত-

জালা মেয়ে পছন্দ নয়। বলল আমাকে জাপানী মেয়েছেলে দেখাও। আমি ওকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। তখন রাত বারোটা বেজে গেছে।···তখন আর কোথায় নিয়ে যাই। ধেনুর ঝোপড়িতে নিয়ে এনে ওকে পেট ভরে চুল্লু খাওয়ালাম। তারপর ও শালা মদ খেয়ে একটু বেসামাল হয়ে পড়লে আমি আবার ওকে বাঁধানো দাঁতের মেয়েটার কাছে নিয়ে গেলাম। এবার ও ওকে চিনতে পারল না। বলল, "—হ্যাঁ এই ধরনের জাপানি মেয়েই চাইছিলাম আমি। শালা জাপানির বাচ্চা···যে মেয়েটাকে ও একটু আগে দশটা টাকা দিতে চাইছিল না, ধেনু ভাইয়ের চুল্লু খেয়ে তাকেই ও পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গেল।"

"আরে এই ধেনুর চুল্লুই খাঁটি, বাকি সব নকল।" ধেনু নিজেও এক পেগ গলায় ঢেলে বলল।

ধেনুর বন্ধু চিমটারাম। ও নিজেও ধেনুর মতো দুধ বেচত, খদ্দের বোঝাই ধেনুর ঝোপড়ির দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "তোর কারবার তো ভালোই চলছে রে। এবার আমিও এই কারবারে নামব ভাবছি।"

"··· না!···না!—" ধেনু ওকে পরামর্শ দিল, "দুধের ব্যবসা চুল্লুর ব্যবসা থেকে অনেক ভালো। দুধে যতোই জল মেশাও খদ্দের কিছু বলবে না। কিন্তু চুল্লুতে এক ফোঁটা জল মিশিয়ে দেখ, আর কোনদিন খদ্দের আসবে না।"

"ধেনু জিন্দাবাদ," একটা কর্মচারী চেঁচিয়ে বলে উঠল।

"সবই ভগবানের কৃপা।"

শিব ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে প্রণাম করল ধেনু।

অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ ধেনু। ওর ঝুপড়ির চারদিকে সব দেব দেবীর ছবি টাঙান রয়েছে।

"ভগবান কোথায়?" এক শ্রমিক হুঙ্কার ছাড়ল। "ঐ তো সামনের সিল্ক মিলে আগুন লেগে গেল। মিল বন্ধ। দু' মাস ধরে বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার বউ আজ কুড়ি বছর ধরে মন্দিরে যায়। ভগবানের কি আমাদের মিলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছিল।"

"আরে এই, আমার এখানে বসে ভগবানকে গালিগালাজ দিও না," ধেনু চিৎকার করে লোকটাকে বলল, "আমার ঝুপড়িতে মদ খেতে হলে ভগবানকে গালি-গালাজ দেওয়া চলবে না।

"কাল থেকে আর কে তোমার এখানে মদ খেতে আসছে,' ঐ শ্রমিকটা তার পেগ খালি করতে করতে বলল। "মনে কষ্ট পাই তাই আমরা ভগবানকে গালি-গালাজ করি। আমি অতো মাথা মোটা নই যে শুধু শুধু ওকে গালি দেব।

ভগবানই আমাদের মিলে আগুন ধরিয়েছে।"

একদম ক্ষেপে গিয়েছিল শ্রমিকটা। পরিবেশটাও একদম তপ্ত করে দিয়ে গেল। অন্যান্য অনেকেই মুখর হয়ে উঠল।…"ঠিকই বলেছে বেচারা। আমার নিজের চুরির ব্যবসাটাও ভালো চলছে না।"

"সিন্ধি শেঠ আমাকে এক মাসের নোটিস দিয়েছে—বাড়ি খালি করে দাও। কোনদিক থেকে খালি করব। কোথায় গিয়ে উঠব?"

"মালিকের গিন্নি বলে তুমি একটা চোর…বান্দ্রার বাজারে আট আনায় আধ কিলো টমেটো পাওয়া যায়, আর তুমি আনতে গেলে বারো আনা লাগে কেন? তুমি একটা চোর। আমি তাকে বলি—আমি কি গরুর মাংস খাই, যে আমি তোমাকে মিথ্যে বলব। আমি একটা পয়সাও চুরি করি না, তবু আমাকে চোরের অপবাদ শুনতে হয়।"

"সত্যি কথা বলতে কি বড়লোকেদের ঘরে বিচার নেই—"

"আমার ছেলে দশ দিন জ্বরে ভুগছিল। ঠাকুরের পায়ে ছোঁয়ান ওষুধ খাওয়াতে ভালো হয়ে গেল। ভগবান তো ভালোই—"

"আরে ভালো বলে ভালো, খুব ভালো।"

"না, না, ভালো নয়, খুব খারাপ।"

দুই মদো মাতালের মধ্যে জোর তর্ক শুরু হয়ে গেল। দুজনেই যেন মোটা মোটা হাত-পা ওলা শক্তিশালী মাছি। ভগবানের গুণাগুণ নিয়ে তর্ক চালান অপেক্ষা নিজেদের শক্তি দেখানোতেই ওরা বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠল।

"আমি বলছি ভগবান খারাপ।"

"আমি বলছি ভগবান ভালো।"

"খারাপ।"

"ভালো।"

মাছি দুটো উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি করবার উপক্রম হয়েছিল। এমন সময় ধেনু ওদের দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "মারপিট করো না। কাউকে ডেকে মীমাংসা করে নাও।"

"হঁ্যা, তাই ঠিক।" দুই মাছিতে বলল। তারপর আমাদের ওপর ওদের চোখ পড়ল। আমরা ওদের পাশের টেবিলে বসেছিলাম। ওরা দুজনেই বেশ গম্ভীর চোখে ভগবানকে দেখতে লাগল। হয়তো আমার তুলনায় ভগবানের মুখ ওদের চোখে বেশি সরল তথা গম্ভীর বলে মনে হয়েছিল। জানি না ঠিক কি ব্যাপার। তবে ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়ে ভগবানের কাছে গিয়ে বলল, "তুমি

এর ন্যায় বিচার করো।"

"ও বলছে"— এক মাছি বলল, "ভগবান ভালো। আমি বলছি ভগবান খারাপ। এবার তুমি বলো আমাদের দুজনের মধ্যে কে সঠিক।"

"কেউই নয়", গম্ভীর স্বরে ভগবান বললেন।

"তা কি করে হয়?" দুজনে রেগে গিয়ে বলল।

"এ জন্যই যে ভগবান কোথাও নেই।"

"ভগবান নেই!" ওরা দুজনে চিৎকার করে বলল। "আরে শুনছ, এ বলছে কি ভগবান বলে কোথাও কিছু নেই।"

"রাম-রাম।"

"কাফের কোথাকার।"

"তুই কি বলছিস রে ভগবান নেই।"

ধেনু এসে ভগবানের গলা চেপে ধরল। "যার খাস, যার পরিস তাকেই গালি-গালাজ দিচ্ছিস। আমার কাছে এসে ধারে মদ গিলিস, আর আমাদের ভগবানকে মানতে চাস না—"

ধেনু ভগবানের গালে সজোরে একটা চড় মারল। আমি ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। বললাম, "—আরে থামো—থামো—থামো, তোমরা জানো এ লোকটা কে? একে তোমরা ছেড়ে দাও।"

"আমাদের হাতে তুলে দাও শালাকে। শালা ভগবানের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। পেটে ছুরি চালিয়ে দেব শালার—"

ঐ দুটো মাছি ভগবানকে মারার জন্য অস্থির হয়ে উঠল।

একটু পরেই পুলিশের সিটি বাজতে লাগল। হুড়মুড় করে চেয়ার টেবিল উলটে সব যে যার মতো পালাতে লাগল। আমিও ভগবানকে নিয়ে মাছিমে গিয়ে উঠলাম। ভগবানের শরীরের নানা অংশ ছড়ে গেছে। রক্ত ঝরছে। আমি জল দিয়ে রক্ত ধুয়ে দিতে লাগলাম।

এখান থেকে দেখতে পেলাম পুলিশ চারপাশ থেকে ঝুপড়ি ঘিরে ধরেছে। ধেনু এবং কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

একটু পরেই আশেপাশের পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে গেলে আমরা বাড়ি ফিরে যেতে লাগলাম। রাস্তায় আমি ভগবানকে জিজ্ঞেস করলাম—

"হঠাৎ তোমার কি হলো বলো তো যে শেষ পর্যন্ত তুমি নিজেই নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বসলে। শুধু শুধু মার খেলে। তুমি জানো না— এটা ভারতবর্ষ। এখানে প্রতি পদে পদে মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বার। আমরা

ভগবানের সবথেকে বড় উপাসক ও পুজারী। আমরা আমাদের ঈশ্বরের জন্ত প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি।"

"নিজের জীবন দিতে পারি না। অন্তের জীবন অবশ্যই নিতে পারি," ভগবান তাঁর শরীরের আঘাতের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বললেন। "তুমি যেসব আঘাতকে আমার বলে মনে করছ, সেগুলো আসলে তোমাদেরই আঘাত। কানপুর থেকে কলকাতা এবং জম্মু থেকে জব্বলপুর পর্যন্ত তোমরা ধর্মের নামে যা কিছু করে চলেছ, তা আজ আমার শরীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে যত আঘাত দিয়ে এসেছ তার সংখ্যা কি একবারও গুণে দেখেছ?

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চোখ খুলে দেখি ভগবান নেই। আমার মনে হলো তাহলে বোধহয় ভগবান কালকের ঘটনায় অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছেন। দুঃখ পেলাম এই ভেবে—আমাকে বলে গেলে তাঁর কি এমন অসুবিধে হতো। আমি কি তাঁর সঙ্গে স্বর্গে চলে যেতে চাইতাম? আবার এ কথা মনে হলো—হয়তো কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন। সবে তো এখন সকাল হয়েছে। সূর্য ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখা যাক। আমার ঘুম এখনো পুরো মাত্রায় হয়নি। আমি তাই আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। শোয়ার আগে চারপাশটা ভালো করে দেখে নিলাম, দরজার তালা ভেতর থেকে দেওয়া আছে কি না এবং জানলার পাল্লাটাল্লা সব ঠিক-ঠাক আছে কি না। দেখলাম সব ঠিকই আছে। কিন্তু সব ঠিকমতো বন্ধছন্দ থাকলেও ভগবানের পক্ষে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কোন কঠিন কর্ম মোটেই নয়। আর মানুষের ইতিহাস থেকেই জানা যে যায় জীবনের অধিকাংশ জটিল মুহূর্তে তাঁকে খুঁজে পাওয়াই যায় না। তাই আমি বিশেষ বিস্মিত না হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম।

খোলা জানালা দিয়ে রোদ চোখে এসে পড়তেই আমি হড়বড়িয়ে জেগে উঠলাম। চোখ খুলে আগে আমার পাশটা দেখে নিলাম। দেখলাম যেখানে ভগবান শুয়ে ছিলেন সে জায়গাটা তখনো খালি। এবার আমার সত্যিই বিশ্বাস হলো যে ভগবান তাহলে চলে গেছেন। কথাটা মনে হতেই আমি ঘরের চারদিকটা ভালো করে দেখে নিলাম। জিনিসপত্র সব ঠিক আছে কি না একবার মিলিয়ে নিলাম। আমার ঘরে জিনিসপত্র এমনিতেই কম, তার ওপর আবার এভাবে চিন্তা করাটাই মনের সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। কিন্তু ভাই সবই কপালের ব্যাপার। আজকাল বোম্বাই শহরে কতোভাবে যে চোর-জোচ্চররা কারবার

চালাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের কেউ হয়ত ভগবানের বেশ ধরে এসে কিছুদিন আমার সঙ্গে থেকে, আমাকে বোকা বানিয়ে সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেল। আমি তাই ভাল করে ঘরের সর্বত্র দেখে নিলাম। একটা ছড়ি ছাড়া আর সবই যথাস্থানে পেয়ে গেলাম। ফলে প্রথমে একটু নিশ্চিন্ত হলাম পরে আবার এ কথা ভেবে লজ্জাও পেলাম, শেষ পর্যন্ত ভগবানকে নিয়ে আমাকে এরকম ভাবে ভাবতে হলো। এই দুটো কথা ভাবার পর আমার মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিল—আচ্ছা কিসের প্রয়োজনে ভগবানকে শেষ পর্যন্ত আমার ছড়িটা নিতে হলো ?

চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে এইসব সাত পাঁচ ভাবছি, এমন সময় আমার পাশেই কারুর পাশ ফিরে শোবার শব্দ শুনতে পেলাম। চমকে উঠে পাশ ফিরে দেখি ভগবান, আমার পাশের বিছানায় শুয়ে রয়েছেন, হাতে সেই ছড়িটা। ঘরের তালা যেমনকার তেমনই দেওয়া রয়েছে। ভগবানের এমন আচরণে তাঁর ওপর আমার অত্যন্ত রাগ হলো। আমি ওঁর গা ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, "অ্যাঁ, কোথায় গিয়েছিলে ?"

"মিস আশারানী আমাকে ডেকেছিল।"

"কোন আশারানী ? সেই প্রখ্যাত ফিল্মষ্টার ?"

"হ্যাঁ।"

"ভগবানকে তার কিসের প্রয়োজন ? ভগবান তো তাকে সব দিয়ে রেখেছে—খ্যাতি, সম্পত্তি এবং একটি বোকা স্বামী। নারীর আর কিসের প্রয়োজন ? এই পৃথিবীতে নারীর যা কিছু প্রত্যাশা তার সবকিছুই তো সে পেয়েছে। আচ্ছা, তুমি ওর প্রাসাদোপম বাড়ির ভেতরে সুইমিং পুল দেখেছ ?"

"এখনই সেখান থেকে স্নান করে আসছি।" ভগবান অত্যন্ত সরলভাবে হাসতে হাসতে বললেন, "আমাদের স্বর্গে তো অমৃতের পুকুর আছে। তাতে পদ্মফুল ফুটে থাকে। কিন্তু এমন সুরভিত জলের পুকুর আমাদের স্বর্গের কোথাও নেই। আর এমন পরিবেশের মধ্যে শ্বেত পাথর দিয়ে তৈরী টয়লেট, রূপোর সিঁড়ি—এসব দেখে আমি যে কি আনন্দ পেয়েছি, তা আর তোমাকে কি বলব।"

"কিন্তু ও তোমাকে ডেকেছিল কেন ?" উদ্গ্রীব হয়ে জানতে চাইলাম আমি। প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে ভগবান বাচ্চা ছেলের মতো লজ্জা পেয়ে চোখ নিচু করে নিতে চাইলেন। কিন্তু আমিও ছাড়বার পাত্র নই। বারবার একই প্রশ্ন করে যেতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ভগবান বললেন, "আমার সঙ্গে ওর প্রেম হয়ে গেছে।"

"এক ফিল্মষ্টারের সঙ্গে তোমার ভালোবাসা ?" আমি বিছানা থেকে ধরমরিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলাম। "তোমার মাথার ঠিক আছে তো ?"

"কেন ঠিক থাকবে না ?" ভগবানও তাঁর বিছানা থেকে উঠলেন। একজন ফিল্ম ষ্টারও মানুষ। তার সঙ্গে আমার ভালোবাসা না হবার কি আছে। তুমি তো জানো না ও আমাকে কতটা চায়। ও নিজের ঘরে কৃষ্ণের সোনার মূর্তি তৈরি করে রেখেছে। প্রতিদিন মীরাবাইয়ের মতো পোশাক পরে ঐ মূর্তির সামনে নাচে। নানা ভাবে আমাকে মুগ্ধ করে। বলে তুমি যদি আমাকে একবার দর্শন দাও তাহলে আমি তোমার চরণ ধুয়ে জল খাবো। তোমাকে এমন গান শোনাব যে তুমি মীরাবাইকে ভুলে যাবে।"

"মিথ্যাবাদী !" আমি রাগের সঙ্গে বললাম।

"না, ও মোটেই মিথ্যাবাদী নয়।" ভগবান ঝাঁঝ দেখিয়ে বললেন। "ও অত্যন্ত সাদাসিধে মেয়ে। বহু দিন ধরে আমি ওকে দেখছি। ভালোভাবে যাচাই না করে আমি তো কারুকে দর্শন দিই না। আজ সকালে দেখলাম ও একটা খঞ্জনি বার করে বুকের ওপর রাখল। তারপর ওকে বলতে শুনলাম, আজ যদি তুমি আমাকে দর্শন না দাও, তাহলে নিজের বুকে এই খঞ্জনি বেঁধে আত্মহত্যা করব আমি। ··· তাই আমি ওকে দেখা দিলাম··· ।"

"ও তোমার খুব যত্ন করেছে, তাই না ?"

"হ্যাঁ, গঙ্গাজল দিয়ে ও আমার পা ধুইয়ে দিয়েছে। রেশমী কাপড় পরতে দিয়েচে। শুদ্ধ, স্বচ্ছ, সাত্ত্বিক খাবার খেতে দিয়েছে। তারপর আমার পায়ের সামনে বসে বীণা বাজিয়ে আমাকে গান শোনাতে বসল। সময়টা বেশ সুন্দর ভাবে কেটেগেল।"

"তোমার ওপর ফিল্মের যাদু ভর করছিল মনে হয়।"

"না, না, তা নয়।" ভগবান আমাকে বুঝিয়ে বললেন। "ঐ নারীর মনটাই ঐ রকম। আমার খুব ভক্ত···আমাকে ও অন্তর দিয়ে ভালোবাসে। আমাকে তো ও আসতেই দিচ্ছিল না।"

"তা কি হলো, তুমি আবার ফিরে এলে কেন ?"

"তোমার ছড়িটা নিয়ে গিয়েছিলাম যে।"

"আমার ছড়ি, হ্যাঁ, কেন নিয়ে গিয়েছিলে ?"

"আরে ভাই ওর ঘরের বাইরে দুটো কুকুর বাঁধা থাকে। বড় ভয়ঙ্কর কুকুর। ঐ কুকুর দুটোকে আমার বড় ভয় করে। তাই তোমার ছড়িটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। বোম্বাই শহরের কুকুরকে বিশ্বাস করা যায় না। শুনেছি ওরা নাকি

ভগবানকেও ভয় পায় না।"

"আমি তোমাকে বলছি", ভগবানকে বুঝিয়ে বললাম আমি, "তুমি তো এখনো বোম্বাই শহরের সব কিছু দেখনি, আর তুমি আমার অত্যন্ত নিকটাত্মীয়ের মতো, সরল মানুষ। তোমার ভালোর জন্যই বলছি এই সব মানুষের চক্রে পড়ো না। সব এক একটা হামবাগ, নিজের ঢাক পিটিয়েই গেল।"

"না···না···না—না—ও সে ধরণের নয়", ভগবান বেশ দৃঢ় স্বরে বললেন, "মনের অবস্থা আমি কি বুঝতে পারি না বলছ?"

কথা ঘোরাবার জন্য আমি ওঁকে বললাম, "আচ্ছা একটা কথা বলো, আজ কোথায় কোথায় যাবে? আজ ভাবছিলাম আমি তোমাকে জুহুতে নিয়ে যাবো।"

"জুহুতে!" ভগবান বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন। "ও-ও তো আজ আমাকে জুহুতে ডেকেছে।"

"কে?"

"আশারানী"

"ঠিক আছে, তাহলে আর আমাকে কি দরকার। তুমি ওর কাছেই যাও—"

"বন্ধু!" ভগবান আমার হাতের ওপর হাত রেখে বললেন, "তুমি আশারাণীকে একদম ভুল বুঝেছ। আমার প্রতি ওর প্রেম খাঁটি এবং স্বার্থশূণ্য।"

এই কথার প্রত্যুত্তরে আমি কিছু বললাম না। ভগবানের হাত সরিয়ে দিলাম। ভগবান লজ্জা পেলেন। আমি ওঁর দিকে পিঠ দিয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। একটু পরেই আওয়াজ শুনতে পেলাম। চোখ খুলে দেখি সামনে দরজার তালা খোলা। ভগবান দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বললেন, "আমি আজও তোমার ছড়ি নিয়ে যাচ্ছি। কালকে আসব। আজ রাতের সেকেণ্ড শোয়ে ওর একটা ফিল্ম দেখাবে আমাকে।"

উঁহু, বলে রাগ দেখিয়ে আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

পরের দিন সকালে ভগবান আমার জন্য মিঠাই, নারকেল, ফুল, ফল ইত্যাদি নিয়ে এলেন। অত্যন্ত খুশি মনে বললেন, "এ সব ও দিয়েছে, আর এগুলো আমি তোমাকে দিচ্ছি। তোমাকে আবার বলছি, তুমি আশারাণীকে চিনতে ভুল করছ। আমার প্রতি ওর ভালোবাসায় কোন খাদ নেই, এমনকি হয়তো ওর প্রেম মীরাবাইকেও হারিয়ে দেবার মতো। এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে কাছ ছাড়া করতে চায় না। সব সময় আমার পায়ে মাথা দিয়ে পড়ে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি আমিও ওকে ভালোবেসে ফেলেছি—"

"তুমি!" আঁতকে উঠলাম আমি। বললাম, "হায়? শালী তোমাকে ফাঁসিয়েছে—আরে ভগবান তুমি কি বলছ—ঐ ফিল্মস্টারের সঙ্গে তোমার প্রেম হয়ে গেছে? তুমি না সমস্ত ঘৃণা আর প্রেমের উর্ধ্বে। তবু ওর সঙ্গে তোমার ভালোবাসা হয়ে গেল?"

"তুমি কখনো ওর মুখ দেখেছ—কি সরল মোলায়েম মুখ—বড় মিষ্টি। কালকের ফিল্ম ফেয়ারে ওর ছবি দেখেছ?"

ভগবানের চোখ মুখে খুশি চমক মারছিল।

"ওর পাতলা পাতলা আঙুলগুলো—আহা! যেন সৃষ্টির প্রথম পর্বের কোন প্রয়াস—"

ভগবানের চোখে আশারাণীর সুন্দর ছবি নাচতে লাগল। "আর ও যখন আমার প্রেমে বেঁহুশ হয়ে হাতে করতাল নিয়ে নাচে, তখন মনে হয় যেন এক মন-মোহিনীর সামনে বসে আছি।"

"সর্বনাশ!"

"আজ রাতে ও আমাকে শকীলাবানু ভূপালীর কাওয়ালি শোনাবে বলেছে।"

"তোমার জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল!" আমি অত্যন্ত নিরাশ হয়ে বললাম। আমি আর একবার শেষ চেষ্টা স্বরূপ ওঁকে বললাম, "তুমি কি একবার ভেবে দেখেছ, স্বর্গ থেকে তুমি এখানে কি জন্য এসেছ? বোম্বাই শহরের বাচ্চাদের আর দেখার ইচ্ছে নেই তোমার?"

"বাচ্চাদের কথায় গুলি মারো এখন।"

"তোমার এই সিদ্ধান্ত পালটাবার জন্য, তোমার নিজের এখন ভয় করছে না?"

"ভালোবাসা যখন করেছি, তখন আবার ভয় কিসের?" ভগবান গুনগুন করে বললেন। হতভম্ব হয়ে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম।

তারপর দুদিন কেটে গেল। ভগবানের আর দেখা নেই। তৃতীয় দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ভগবান আমার পাশে বেহুঁশ অবস্থায় শুয়ে রয়েছেন। ওঁর পরনে ময়লা গেঞ্জি, ছেঁড়া-ফাটা প্যান্ট। মাথার চুল এলোমেলো। নিষ্পাপ কিশোর মুখখানিতে শিশুর চিন্তার ছায়া ভাসমান।

ওঁকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে তুললাম। চোখ রগড়াতে উঠে বসলেন উনি। "কি হলো?" জিজ্ঞেস করলাম, "আশারাণী ঘর থেকে বার করে দিল?"

"আরে না ভাই।" অনুশোচনায় হাত কচলাতে কচলাতে চোখ নিচু করে ভগবান বললেন, "সে অন্য ব্যাপার রে ভাই।"

"তা শেষ পর্যন্ত কি হলো, আশারাণীর ভালোবাসার চাকা ঘুরে গেল?"

"না ভাই, সে সব কিছু নয়। কাল রাতে ও এতো নাচল যে নাচতে নাচতে শেষে আমার পায়ের সামনে চুল খুলে লুটিয়ে পড়ল। আর আমার পা জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি বড় বিপদে পড়েছি ভগবান, আমি বড় বিপদে পড়েছি। আমাকে বাঁচাও তুমি।"
"আশারাণীর আবার বিপদ কি?" আমি ভগবানকে ব্যঙ্গভরে জিজ্ঞেস করলাম।
"বুঝেছি ও মনে হয় ওর বোকা স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিতে চায়।"
"না ভাই—" ভগবান উদাস স্বরে বললেন, "ইনকাম ট্যাক্সের কেস—"
আমাদের ঘর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল। ভগবান মাথা নিচু করে অনুশোচনায় হাত কচলাতে লাগলেন।
শেষে আমি বললাম, "ওর প্রেম নিঃস্বার্থ নয় জেনে তোমার আপসোস হচ্ছে, তাই না।"
ভগবান কিছু বললেন না তবে অনুশোচনায় নিচু মাথা আর উঁচু করলেন না।
"এই পৃথিবীতে কে আর নিঃস্বার্থ ভাবে প্রেম করে। এ জীবনে যে জিনিসটার অভাব সে বোধ করে সেটা পাবার জন্যই কেবল তোমার কাছে যায়।... একটা ছেলে, একটা বাড়ি, একটা স্বামী বা এক টুকরো রুটি... যার কাছে এর সব কিছুই আছে, সে এই পৃথিবীতে নিজের জন্য স্বর্গ রচনা করে, তোমার দুনিয়ার স্বর্গে নিজের স্থান নিশ্চিত করার জন্য তোমার কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। লক্ষ লক্ষ কালো টাকা রোজগার করে একটা মন্দির, মসজিদ, গির্জা তৈরী করে দেয়—এটা স্বর্গে ঘর রিজার্ভ করা নয়তো কি? এইসব মানুষের কাছে তোমার পরিচয় একটা আই. সি. এস. অফিসার বা মন্ত্রীর থেকে আর কি এমন বেশি! ওহে সরল মতি ঈশ্বর—ওরা তোমার পূজো করে না, নিজেদের মনোবাসনাকে পূজো করে—"
রাগের মাথায় আমি হয়তো আরো অনেককিছু বলতাম। কিন্তু ভগবানের সরল সরল মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। আমি ওঁর গলা জড়িয়ে ধরলাম। গলা জড়িয়ে ধরতে ভগবান ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ওঁর কান্নার মধ্যে এমন একটা চমক ছিল, যেন প্রকৃতি এখনই ফেটে পড়বে।
পরের দিন থেকে আমরা দুজনে আবার আমাদের পুরনো কাছে লেগে পড়লাম। আমাদের আর্থিক অবস্থা ভেঙে পড়েছে। স্বর্গ থেকে আরো ফরেন এক্সচেঞ্জ চেয়ে পাঠানোর মানে হয় না। তাই আমরা দুজনে একটু বেশি বয়সের বাচ্চার রূপ ধরে চার্চ গেট স্টেশনের বাইরে কাজের সন্ধানে ঘুরতে লাগলাম। এখানে এক-

দল ছেলে ট্রেনের যাত্রীদের ট্যাক্সি ধরে দেবার কাজ করে। এরা এদিকে ইরোজ সিনেমা, ওদিকে অ্যামবাসাডার হোটেল পর্যন্ত চলে যায় এবং ট্যাক্সি বোঝাই করে খরিদ্দার নিয়ে আসে। এই কাজের জন্ম খরিদ্দার পিছু ওরা দু আনা করে পায়। কোন কিপটে গ্রাহক এক আনা দিলে, শোরগোল, মারামারি শুরু হয়ে যায়। আমরা দুজনে এই কাজ করতে গেলাম, কিন্তু ছেলেদের ঐ গ্রুপটা আমাদের নিতে চাইল না। ওদের লিডার বলল :

"আমরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কুত্তার মতো দৌড়ে দৌড়ে সারাদিনে আট দশ আনা পয়সা রোজগার করি। তাতে কোন রকমে চা, সিগারেট আর এক বেলার খাবার জোটে। ট্যাক্সি কম, কাজের ছেলে বেশি। মাঝে মাঝে খদ্দেররা নিজেরাই ট্যাক্সি ধরে নেয়। এভাবে কি আর কারবার ভাল চলে! এখন আবার তোমরা আমাদের সঙ্গে জুটলে ঝামেলা আরো বেড়ে যাবে।"

সেখানে হতাশ হয়ে আমরা সামনে ফুটপাথের পাশে বসে বুটপালিশ করতে থাকা কয়েকটা ছেলের কাছে গেলাম। ছেলেগুলোর পরনে ঝকমকে বুশ শার্ট, কোমরে শক্ত করে বাঁধা বেল্ট। কালো প্যান্ট হাঁটুর ওপর পর্যন্ত গোটানো। পালিশের কাঠের বাক্সে নানা রং-এর সব পালিশের কৌটো বসান। আমাদের মনে হলো এ কাজটা আমাদের বেশ ভালো মানাবে।

বুট পালিশওলা ছেলেগুলোর দাদার সঙ্গে আমরা দেখা করলাম। সে আমাদের সমস্যার কথা শুনে বলল, "আমি তোমাদের কাজ দিতে পারি। কিন্তু সকাল আটটায় স্টেশনে আসতে হবে এবং রাত বারোটার পরে স্টেশন থেকে যেতে পারবে।"

"তা কেন?" ভগবান বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন। "সরকারি রেট অনুযায়ী আট ঘন্টার বেশি তুমি আমাদের দিয়ে কাজ করাতে পারো না।"

"তাহলে সরকারের কাছে যাও, আমার কাছে এসেছ কেন?"

"এই পৃথিবী ভগবানের, শাসন সরকারের। ফুটপাত কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।" ভগবান কড়া সুরে বললেন, "আমরা ক্ষুধার্ত শিশু, আমরা আমাদের বাক্স নিয়ে এখানে আসছি। যা টাকা রোজগার হবে তা দিয়ে আমরাই খাবো।"

"ওসব কারবার বোম্বাইয়ে চলে না দাদা," মস্তানটা কড়া সুরে ভগবানকে বলল, "এই ফুটপাতটা টুকরো টুকরো করে আমরা ভাগাভাগি করে নিয়েছি। প্রতি সপ্তায় আমাদের এ জায়গার জন্ম হপ্তা দিতে হয়। তুমি আমার জায়গায় কাজ করলে ধরা পড়ে যাবে। হাজতে পচে মরতে হবে। এটা বোম্বাই শহর। এখানে কাজ করতে হলে আমাদের আণ্ডারে কাজ করতে হবে। আমি তোমাকে কালি দেব,

ছুটো বুশ শার্ট দেব, দিনে দুবার খাবার দেব, দু বার চা সাপ্লাই করব। পালিশের অন্য সব মেটিরিয়াল সাপ্লাই করব। তোমাকে কেবল পালিশ করতে হবে আর এক টাকা করে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে। বাকি যা রোজগার হবে সব আমার থাকবে। পালিশের কাজ শেষ হয়ে গেলে রাত্তিরে মেয়েছেলে সাপ্লাইয়ের কাজ শুরু হবে। সে কাজও তোমাকে করতে হবে।

"তুমি বাচ্চাদের মেয়ে চালানের কাজেও লাগাও?" ভগবান বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

"আরে ভাই, তুমি কোন শহর থেকে এসেছ যে এমন উলটো পালটা সব প্রশ্ন করছ? বোম্বাই শহরে জিনিসের দাম এতো বেশি যে বাচ্চারা কাজ না করলে, না খেতে পেয়ে মারা যাবে। তাই ওরা সবাই কাজ করে। কাগজ বিক্রি করা থেকে মেয়েছেলে সাপ্লাই পর্যন্ত সব কাজ করে দেবার জন্য দশটা ছেলে আমার কাছে ছুটে আসে। দশটা বাচ্চাকে পুলিশ ধরে রিফরমেটরিতে পাঠিয়ে দিলে, নতুন কুড়িটা বাচ্চা দৌড়ে আসে। তুমি জানো না এখানে বেকারি কি তীব্র। জানি না তুমি কোন শহর থেকে এসেছ। আর এই মেয়েছেলে চালান দেওয়ার কাজটা খারাপ নাকি? এসব কাজ বাচ্চারা করবে না তো কারা করবে। বাচ্চাদের দিয়ে এসব কাজ করার সবথেকে বড় লাভ এটাই, ওদের কেউ সন্দেহ করে না। ওরা কোন খদ্দেরের সঙ্গে কথা বললে, কোন বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লে, কোন মেয়েছেলের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে গেলে, ওদের ওপর পুলিশ সন্দেহ করে না। তাই এসব কাজ তো বাচ্চাদের পক্ষেই উপযুক্ত—একদম নিরাপদ, পয়সাও ভালো পাওয়া যায়। সারাদিন বুট পালিশ করে কি আর এমন পাওয়া যায়—মাত্র এক টাকা? আমার এইসব ছেলেরা তো দিনে একটা টাকা সিনেমার পেছনেই খরচ করে। অন্য দরকারের টাকা কোথা থেকে আসবে। তাই এরা স্বেচ্ছায় রাতে অন্য কারবারে নামে। অন্য কাজ করে কখনো এক টাকা, কখনো দু টাকা, কখনো পাঁচ টাকাও পেয়েও যায়। এই পাওয়ার ব্যাপারটা কারবারের ওপর নির্ভর করে। তোমাদের দুজনকে দেখে তো আমার ভালো ছেলে বলে মনে হচ্ছে। আর এই ছেলেটা কে (মস্তান দাদা ভগবানকে দেখিয়ে বলল) তো অত্যন্ত সরল ভালো মানুষ বলে মনে হচ্ছে। এই কাজের পক্ষে ও সবচেয়ে উপযুক্ত। পুলিশ অন্তত দশ বছর জানতেই পারবে না এ মেয়েছেলের দালালীর ব্যবসা করে। বলো, কাজ করবে?"

আমি ভগবানের দিকে তাকালাম, ভগবান আমার দিকে তাকালেন। আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ভগবান বললেন, "চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।"

"আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। চলোনা, এই দাদার কথামতো কাজে লেগে পড়ি।"

"না. না, তুমি এখন চলো, এখান থেকে ভেগে পড়ি।"

জোর করে ভগবান আমাকে ওখান থেকে টেনে নিয়ে চললেন।

মেরিন ড্রাইভের ওপর দিয়ে এখন হেঁটে যাচ্ছি আমরা। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে আর আমাদের শরীরের ওপর মিষ্টি হাওয়া ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আমরা আস্তে আস্তে সমুদ্র তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, আর ভগবান আমাকে বলছিলেন :

"বাচ্চাদের এসব নোংরা কাজ না করাই উচিত। শিশুরা তো দেশের সম্পদ। তাদের স্বভাব এভাবে খারাপ করে দেওয়া, আত্মাকে কলুষিত করা মোটেই ভালো কাজ বলে মনে হচ্ছে না। বাচ্চাদের এ সময় স্কুলে লেখাপড়া করা উচিত। সভ্যতা শেখার, সভ্য হওয়ার, শিক্ষা লাভের এই তো বয়স···আর আমি দেখছি কি—বাচ্চারা চুল্লু বিক্রি করছে, মেয়েছেলে সাপ্লাই করছে, কুকুরের মতো ট্যাক্সির পেছন পেছন দৌড়চ্ছে। আমি তো তাদেরকে এই কাজ করার জন্ম পৃথিবীতে পাঠাইনি। বোম্বাই শহরে কি কোন হাইস্কুল নেই। তোমাদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে পড়ে না? ভালো জামা কাপড় পরে না। বই পড়ে না? শিক্ষকদের কাছে জীবনের প্রকৃত পাঠ গ্রহণ করে না?—এসব শিশুরা—"

আমি ক্লান্ত কণ্ঠে বললাম, "সেরকম বাচ্চাও আছে। যদিও তারা সংখ্যায় কম, তবু সেরকম বাচ্চাও আছে। আজই আমি তোমাকে মালাবার হিলস-এর মর্ডান স্কুলে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সারাদিন পথ চলতে চলতে আমি একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিছু না খেলে আর পারছি না।"

"মর্ডান স্কুল কোথায়?" ভগবান জিজ্ঞেস করলেন আমাকে।

"এই সামনে মালাবার হিলস-এর পাহাড়ে।"

আমি হাতের ইশারা করে বললাম।

মেরিন ড্রাইভের জল উছলে উছলে পড়া মালাবার হিলস-এর দিকে ভগবানের চোখ চলে গেল। ভগবান আমাকে বললেন, "চোখ বন্ধ করো তোমার।"

চোখ খুলে দেখি আমরা দুজনে মর্ডান স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

স্কুল বিল্ডিংটা খুব সুন্দর। বড় বড় পাথর দিয়ে তৈরি বিশাল দোতলা বিল্ডিং। গোলাপি রং চকচক করছে। বড় বড় দরজা জানলায় সাদা রং। আর বিল্ডিং-এর চারপাশে বিশাল বারান্দার পরেই সবুজ ঘাসের লন। লনে পরিষ্কার

পোশাক পরা বাচ্চারা সদ্য ফোটা ফুলের মতো হেসে খেলে বেড়াচ্ছে।
"এই তো স্কুল, একেই তো স্কুল বলে", ভগবান খুশি হয়ে বললেন।
তারপর ভগবান এক চাপরাশিকে দাঁড় করিয়ে বললেন, "তোমাদের স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল কোথায়?"
চাপরাশিটা আমাদের দিকে টেরা চোখে তাকিয়ে দেখল। আমাদের ময়লা কোঁচকানো পোশাক দেখে অনুমান করে বলল, "তোমরা যদি বার্নিশ কোম্পানি থেকে বিল নিয়ে এসে থাকো, তাহলে সোজা অ্যাকাউনটেন্টের সঙ্গে দেখা করো।"
ভগবান অত্যন্ত দৃঢ়স্বরে বললেন, "না, আমরা বার্নিশ কোম্পানি থেকে আসিনি। আমরা প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"
চাপরাশি প্রিন্সিপ্যালের ঘরের দরজার দিকে ইশারা করে বলল, "বড় সাহেব ঐদিকে বসেন।"
ও যে দরজাটা দেখিয়ে দিল, ঐ দরজার সামনে সবুজ রং-এর পর্দা ঝুলছে এবং বাইরে পেতলের পাতের ওপর লেখা রয়েছে 'প্রিন্সিপ্যাল'। দরজার দু-দিকে ফুলের টব। ঘটনাচক্রে প্রিন্সিপ্যালের চাপরাশি তখন ওখানে ছিল না। তাই আমরা এটাকে ভালো সুযোগ মনে করে সোজা প্রিন্সিপ্যালের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।
প্রিন্সিপ্যাল মাঝারি আয়তনের গোলগাল চেহারার মানুষ। মানুষটার মুখে হাসি লেগেই আছে। উনি হাসলে মনে হচ্ছে একশো পাওয়ারের বাব বুঝি জ্বলে উঠল এবং ওঁর মুখ থেকে যেন আলো বিকীর্ণ হতে থাকে। আমরা যখন ওঁর ঘরে ঢুকলাম, তখন উনি টেবিলের ওপর মুখ নিচু করে কিছু একটা লিখছিলেন। শব্দ শুনে মাথা না তুলে, আমাদের দিকে না তাকিয়েই উনি বললেন "বলুন আমি আপনাদের কি উপকার করতে পারি?"
"স্যার, আমরা দুটি শিশু আপনার স্কুলে ভর্তি হতে চাই।"
ভগবান অত্যন্ত মধুর স্বরে উত্তর দিলেন। প্রিন্সিপ্যাল মাথা তুললেন। তারপর ওঁর মুখের ওপর হাসি ভেসে উঠল। একটু আগেই এই হাসির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছি। আমাদের দিকে চোখ পড়তেই মনে হলো কে যেন ঐ সুইচ অফ করে দিল। ওঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল।
"মিউনিসিপ্যাল কমিটির স্কুলে চেষ্টা করো," অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললেন।
ভগবান বললেন, "কিন্তু আমাদের যে এই স্কুলই পছন্দ।"
"কোন ক্লাসে ভর্তি হতে চাও", জিজ্ঞেস করলেন প্রিন্সিপ্যাল।
"ক্লাস ফাইভ।"

"ক্লাস ফাইভে তো আগামী চার বছরের সিট রিজার্ভ হয়ে আছে।"

"এটা স্কুল না রেলগাড়ির কামরা ?" আমি বললাম।

প্রিন্সিপ্যাল যদিও ভারতীয়, তবু এ সময় ইংরেজদের মতো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, "তাছাড়া যারা বার্ষিক পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পায়, বাইরের সেইসব ছেলেদেরই শুধু আমরা নিয়ে থাকি।"

"আচ্ছা", ভগবান বললেন।

আমি বললাম, "ইনি তো সর্বদা সর্বত্র ফার্স্ট হয়ে এসেছেন।"

"বাঃ ? সে তো খুবই ভালো", প্রিন্সিপ্যালের মুখ আবার খুশিতে চমকে উঠল। উনি একটা ফর্ম বার করে বললেন, "তোমার বাবার নাম কি, উনি কি কাজ করেন ?"

ভগবান উত্তর দিলেন, "আমার বাবা মা কেউ নেই।"

"তাহলে তুমি লেখাপড়া করবে কি করে।" প্রিন্সিপ্যাল বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন।

"ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছেলেরা ছাত্র বৃত্তি পায় না ?"

"ছাত্র বৃত্তি পাবে—মাসে পনেরো টাকা। কিন্তু তাতে কি হবে !"

"পনেরো টাকায় আমার চলে যাবে।" ভগবান বললেন।

"পনেরো টাকা তো আমাদের স্কুলের বাচ্চাদের ধোপার খরচ", প্রিন্সিপ্যাল হাসতে হাসতে বললেন, "সব মিলিয়ে এক একটা বাচ্চার পেছনে আমাদের স্কুলে মাসে আড়াইশো টাকার মতো খরচ।"

"এক একটা বাচ্চার পেছনে আড়াইশো টাকা খরচ করার মতো লোক বোম্বাইয়ে কতো আছে ?" জিজ্ঞাসা করলেন ভগবান।

"এই লক্ষ লক্ষ শিশুর শহরে কয়েক হাজার তো হবেই।"

"তাহলে বাকি লক্ষ লক্ষ শিশু পড়বে কোথায় ?"

"তাদের জন্য অন্য অনেক স্কুল আছে।"

"কিন্তু সেসব স্কুল তো এতো ভালো নয়। এই ধরনের ভালো স্কুলে যারা পড়তে চায় তারা কি করবে ?"

"তাদেরকে কোথাও থেকে কোটিপতি বাপ-মা ধরে আনতে হবে। দ্যাট উইল ডু", প্রিন্সিপ্যাল বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন, "আমার অতো তর্ক করার সময় নেই। তোমরা এখন যাও।"

ওখান থেকে চলে এলাম আমরা। কিন্তু ভগবান মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। হঠাৎ উনি একটা ক্লাসের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আমার বারন শুনলেন না।

ক্লাসের ছেলেগুলো আমাদের দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকাল। ক্লাস টিচার তখন আবেগের মাথায় পড়িয়ে যাচ্ছিলেন, তাই এদিকে নজর দিতে পারলেন না।
ক্লাস টিচার নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ওপর ভাষণ দিচ্ছিলেন।
"নেপোলিয়ান বোনাপার্ট একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন।"
ভগবান সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন অসাধারণ মানুষ ছিলেন?"
"তিনি ইওরোপ জয় করেছিলেন", শিক্ষক বললেন।
"তিনি একা কি ইওরোপ জয় করেছিলেন?" ভগবান বললেন, "তাঁকে সাহায্য করার জন্য কি লক্ষ লক্ষ সৈন্য ছিল না। হ্যাঁ যদি উনি ঐ সৈন্যদের সাহায্য ছাড়া একা ইউরোপের একটা সামান্য শহরও জয় করতে পারতেন তাহলে আমি তাঁকে মহান, অসাধারণ বলে স্বীকার করে নিতে রাজি আছি।"
"তিনি তাঁর সময়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠ সেনা নায়ক ছিলেন।"
"যুদ্ধ লড়ার মধ্যে কি এমন শ্রেষ্ঠত্ব আছে? যুদ্ধে হাজার হাজার লোক মারা যায়। একটা মানুষকে খুন করলে যদি কেউ খুনি হয়, তাহলে হাজার হাজার মানুষকে যে খুন করে সে মহান মানুষ হয় কি করে।"
ক্লাসের শিক্ষক ভালো করে তাকিয়ে দেখে বললেন, "তুমি কে হে! তুমি তো মনে হচ্ছে আমার এই ক্লাসের ছাত্র নও। তুমি তো স্কুলের ড্রেসও পরোনি—যাও, বেরিয়ে যাও ক্লাস থেকে।"
ভগবান হাসতে হাসতে তখনই ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন। ক্লাস টিচার ওঁর কথা শুনে বেজায় ক্ষেপে গিয়েছিলেন।
ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে দেখি এক জায়গায় কয়েকটা ছেলে ভলিবল খেলছে। আমরাও ওদের মধ্যে ভিড়ে গেলাম। ভগবান বলটা হাতে ধরে হাসতে হাসতে বললেন। "আমরাও খেলব।"
"তুমি কে হে, আমাদের স্কুলের ছাত্র তো নও।"
"আরে তাতে কি হয়েছে। তোমরাও বাচ্চা ছেলে, আমরাও বাচ্চা ছেলে। সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে খেলব।" বল নাচাতে নাচাতে ভগবান বললেন।
"না, আমরা তোমার সঙ্গে খেলব না। আমাদের বল দিয়ে দাও আমাদের। তোমার সঙ্গে খেলব না আমরা। আমাদের যা হয় হোক, তাতে তোমার কি!"
ভগবান আগের মতোই অনুনয় করতে লাগলেন।
"আমাদের বল দিয়ে দাও বলছি।" ছেলেগুলো চারদিক থেকে ঘিরে ধরে বলতে লাগল। "কোথাকার একটা রাস্তার কুকুর আমাদের স্কুলে ঢুকে পড়েছে।" একটা ছেলে রাগ দেখিয়ে কথাটা বলল।

একটা ছেলে ঘুসি পাকিয়ে এগিয়ে এসে ভগবানের মুখে একটা ঘুসি মারল। তারপর আমার মুখে ঘুসি মারল আর একটা ছেলে। আমি আর চোখে কিছু দেখতে পেলাম না। অন্ধকার দেখতে লাগলাম চোখে। চোখের সামনে তারা নাচতে দেখলাম।

সন্ধ্যেবেলা আমরা যখন আমাদের ক্ষতবিক্ষত কালশিটে পড়া শরীর নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছি তখন ভগবান অত্যন্ত ঘেন্নার সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা—এই তোমাদের শহর! এখানে বাচ্চারাই দেখছি বাচ্চাদের ঘেন্না করে।

"ঘুমোচ্ছ না কেন?" বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভগবান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

"ঘুম আসছে না।"

"কেন আসছে না।"

"খুব খিদে পেয়েছে।"

"খিদে পেয়েছে তো তন্দুরী মুর্গি খাও, পোলাউ খাও, বিরিয়ানি খাও, চিকেন কাবাব খাও। কে বারণ করেছে।" মুচকি হেসে ভগবান বললেন। বোম্বাইয়ে এমন হাজার হাজার রেস্তোরাঁ আছে যেখানে এসব খাবার পাবে।

"কিন্তু পকেটে পয়সা না থাকলে তোমার পৃথিবীতে কিছুই পাওয়া যায় না, এখনো বলো আমি কি করে খাবো, কোথায় খাবো।" আমি রেগে গিয়ে বললাম।

"তাহলে হাওয়া খাও। আমি সবার জন্য হাওয়া ফ্রি করে দিয়েছি।" ভগবান হাসতে হাসতে বললেন।

"ঠিক আছে।" দাঁতে দাঁত পিসে বললাম। "আজ রাতে আমি হাওয়াই খাবো। চলো আমার সঙ্গে।"

"না, আমার ঘুম পাচ্ছে।"

"আর আমার ঘুম পাচ্ছে না। তাই তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

"কোথায়?"

"হাওয়া খেতে। ওঠো চলো।" আমি ভগবানকে মাদুর থেকে ঠেলে তুললাম।

"না, আমাকে এখন একটু ঘুমোতে দাও।"

যতোক্ষণ না আমি খাবার পাচ্ছি, ততোক্ষণ আমি তোমাকে ঘুমোতে দেব না।" আমি জেদ ধরে বসে রইলাম।

... রাত তখন প্রায় এগারোটা বাজে, তবুও হাওয়া তখনো গরম, গুমোট পরিবেশ, মনে হয় যেন গলার ভেতর গিয়ে চেপে বসবে। এক অদ্ভুত দুর্গন্ধযুক্ত গুমোট পরিবেশ।

"একে তুমি হাওয়া বলো ?" আমি ভগবানকে জিজ্ঞেস করলাম।

রাস্তায় বেরিয়ে ভগবান আবার বাচ্চা হয়ে গেছেন। ওঁর মুখে সেই নিষ্পাপ হাসি। চোখ আধো ঘুম আধো জাগা। চলতে চলতে ঘুমিয়ে পড়ার মতো টলতে টলতে চলছেন। আমি ভগবানকে ভালো করে গা ঝাঁকুনি দিয়ে ধাক্কা দিলাম। বললাম, "ঐ দেখ।"

"কি ?···কোথায়···" ভগবান ধরফরিয়ে উঠে বললেন।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা তিলক ব্রিজের নিচে পর্যন্ত চলে এসেছি। এখানে চারপাশ চুপচাপ, রাস্তা ফাঁকা, আশেপাশের গলিপথগুলোও জনমানব শূন্য, অন্ধকার নীরব। পুলের নিচেটা বেশ অন্ধকার।

সামনে জঞ্জালের স্তূপের পরেই রেলের ইয়ার্ডের জঙ্গল। তার পরেই রেলের লাইন চকচক করছে। আশ পাশের গাছের আড়াল ভেদ করে রাস্তার আলো রেল লাইনের ওপর এসে পড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। এই নিশ্চিন্ত নীরব পরিবেশে পুলের মাঝামাঝি এক সিঁড়িতে বসে একটা রোগা পাতলা ছেলে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে কাগজের ঠোঙায় ভেলপুরি খাচ্ছে।

"ঐ দেখ, ছেলেটা একা বসে ভেলপুরি খাচ্ছে, চলো ওর কাছ থেকে ভেলপুরি ছিনিয়ে নি।" আমি পরামর্শ দিলাম।

"সেটা অন্যায় কাজ হবে," ভগবান অনিচ্ছা প্রকাশ করে বললেন।

"অন্যায় হলে হবে···আমারও তো খিদে পেয়েছে, কি করব ?" আমি বললাম।

"জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া পাপ। আমি এ কাজে অনুমতি দিতে পারি না। তবে আমরা ঐ ছেলেটাকে অনুরোধ করতে পারি," ভগবান বললেন।

ছেলেটার কাছে গিয়ে আমি একদিকে দাঁড়ালাম, ভগবান আর একদিকে দাঁড়ালেন। আমাদের মধ্যিখানে ছেলেটা অত্যন্ত নিশ্চিন্তে বসে ভেলপুরি খাচ্ছে। আমাদের অনুরোধ শুনে ছেলেটা কাগজের ঠোঙাটা আমাদের দিকে এগিয়ে দিল। বিদ্যুৎ বেগে আমার হাত এগিয়ে গেল। পর মুহূর্তেই একগ্রাস ভেলপুরী আমার মুখের মধ্যে চালান করে দিলাম।

আমার ব্যস্ততা দেখে ছেলেটি মুচকি হেসে বলল, "মনে হচ্ছে তোমরা কদিন কিছু খাওনি।"

"এতে আর সন্দেহের কি আছে," আমি তৃতীয় গ্রাসটা মুখে পুরে বললাম। ভেলপুরীর স্বাদ অদ্ভুত। মুচমুচে, টকটক, ঝাল ঝাল, নোনতা টাইপের। খেয়ে বেশ আনন্দ পেতে লাগলাম।

ছেলেটা পা দোলাতে দোলাতে বলল, "তোমরা দুজনে আমার সঙ্গে কাজ করবে

আমি তোমাদের এক টাকা করে দেব।"
"এক টাকা—পুরো এক টাকা!" বিস্ময় প্রকাশ করে আমি বললাম।
"কিন্তু কাজটা কি?" ভগবান জিজ্ঞেস করলেন।
"খুব সহজ কাজ।" ছেলেটা পুলের ডান দিকে তাকিয়ে একটা আবছা অন্ধকার গলির প্রতি ইশারা করে বলল, "ঐ মোড় থেকে এখনই এক পার্সি বাবা আসবে। মাথায় তার কালো টুপি, গায়ে সাদা ফতুয়া, হাতে ব্যাগ থাকবে। সে ওই পুলের কাছে এলে তোমরা দুই ছোকরা মিলে ওর পা জড়িয়ে ধরবে।"
"পা জড়িয়ে ধরবো!…কেন?" জিজ্ঞেস করলেন ভগবান।
"পা জড়িয়ে ধরে ভিক্ষে চাইবে। বলবে—পার্সিবাবা এক আনা পয়সা দাও। সকাল থেকে কিছু খাইনি…এক আনা পয়সা দাও না।"
"তারপর?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।
"সে পকেট থেকে তোমাদের দু আনা বার করে দেয় তো ভালো, না দিলেও কোন অসুবিধে নেই। ‥ তোমাদের টাকা তোমরা ঠিক পেয়ে যাবে।"
"কিন্তু দু আনা পয়সার জন্য তুমি আমাদের এক টাকা করে দেবে কেন…", ভগবান জিজ্ঞেস করলেন।
ছেলেটা বলল, "তোমার অতো জানার প্রয়োজন নেই। ষোল আনা পয়সা রোজগার করতে চাও তো যা বললাম তাই করো। নইলে রাস্তা দেখ।"
"চলো করা হোক, কি আর অসুবিধে," আমি ভগবানকে বললাম। "খালি একবার পার্সিবাবার পা ছুঁয়ে যদি একটা টাকা পাওয়া যায় তাহলে খারাপ কি। তোমার পা ছুঁয়ে আজ পর্যন্ত তো একটা ঢেলাও পাওয়া গেল না।"
"সে তুমি ঠিকই বলেছ," ভগবান বললেন। "আমার মনে হচ্ছে ছেলেটা খুব দয়ালু। দু আনার বদলে ষোল আনা দিতে চাইছে। এই ধরনের বাচ্চা ছেলের সন্ধানেই আমি স্বর্গ থেকে এসেছি। তুমি কি মনে করো বোম্বাইয়ের বাচ্চারা কি অবস্থায় আছে আমি জানি না? কিন্তু আমি মনে করতাম এবং ঠিকই মনে করতাম পাপ ও পিপাসার এই অন্ধকার বস্তিতে কোথাও না কোথাও আমি এমন একটা ছেলে পেয়ে যাবো, যে ছেলেটা সৃষ্টির প্রথম দিনের মতো সরল ও নিষ্পাপ। সেই ছেলেটাকে আমি আজ পেয়ে গেলাম।"
ভগবান আদরের চোখে ঐ দশ বছরের ছেলেটার দিকে তাকালেন। প্রতি উত্তরে ছেলেটা পুলের সিঁড়িতে বসে মুচকে মুচকে হাসতে হাসতে ঐ আধো-অন্ধকার গলির দিকে চেয়ে রইল।
কিন্তু আমার কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগল। ঐ ছেলেটাকে বলতে বাধ্য হলাম,

"পরে যে তুমি আমাদের একটা টাকা দেবে তার কি নিশ্চয়তা আছে। তোমার কাছে পুরো একটাকা আছে কি না তাও তো জানি না ?

ছেলেটা পকেট থেকে এক টাকার দশটা নোট বার করে আমাদের চোখের সামনে নাচাতে নাচাতে বলল, "আমার কাছে একটা নয়, দশটা এক টাকার নোট আছে। এ ন টাকা আমার আর একটাকা তোমাদের। তোমরা আমার কাজ করতে চাইলে, আর আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে এই নাও আট আনা আগাম। এটা নিয়ে এখন পকেটে রেখে দাও। পার্সিবাবার কাছে গেলে বাকি আটআনা পাবে।"

আট আনা পয়সা পকেটে ফেলতে পেরে তবে একটু বিশ্বাস হলো। আমরা তিন জনে পুলের ওপর বসে ঐ আধো-অন্ধকার মোড়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম, যে দিক থেকে পার্সিবাবার আসার কথা।

কিছুক্ষণ পরে সত্যিই পার্সিবাবা মাথায় টুপি পরে, গায়ে লম্বা ফতুয়া চাপিয়ে ঐ অন্ধকার গলির দিক থেকে বেরিয়ে এলেন, ওঁকে দেখতে পেয়েই ছেলেটা আমার কনুই ধরে নাড়া দিয়ে বলল,···ঐ ··ঐ লোকটাই, পুলের কাছে এসে পড়লে ওর পা জড়িয়ে ধরবে···"

আমি বললাম, "একদম চিন্তা করো না, এমন ভাবে পা জড়িয়ে ধরব যে, যতোক্ষণ না দু আনা পয়সা বার করছে ততোক্ষণ মোটে পা ছাড়ব না।"

"শাবাস!" ছেলেটা খুশি হয়ে ফিসফিস করে বলল।

একটু পরেই লোকটা পুলের অনেকটা কাছে চলে এলো, পুলের শুরুতে পৌছলে আমি এক লাফ মেরে এগিয়ে গিয়ে লোকটার পা জড়িয়ে ধরলাম। আমার আচরণে ঘাবড়ে গিয়ে পার্সিবাবা বলল, "কি হলো, কি ব্যাপার ?"

"গরীব মানুষ বাবু, দুদিন ধরে খাওয়া হয়নি···দু আনা পয়সা দাও।"

"যা, সর্—সর্", পার্সি রাগ দেখিয়ে বললো।

আমি আরো জোরে ওর পা জড়িয়ে ধরে কাতর স্বরে বললাম, "ওপরওয়ালা আশীর্বাদ করবে বাবু···মাত্র দুআনা পয়সা তো।"

এইবার পার্সিবাবা ঝুঁকে ব্যাগ খুলে খুচরা পয়সা খুঁজতে লাগলেন। আমি ওঁর পা জড়িয়ে ধরে ঘ্যান ঘ্যান করে যেতেই লাগলাম···"বাবু অনাথ আমি, আমাকে কেউ দেখার নেই···কদিন কিছু খাওয়া হয়নি···"

হঠাৎ পার্সিবাবা তীব্র আর্তনাদ করে উঠলেন। ওঁর ব্যাগ মাটিতে পড়ে গেল। রক্তে গা ভেসে যেতে লাগল। মাটিতে পড়ে গেলেন। এদিকে দেখি ঐ রোগা পাতলা ছেলেটা হাতে একটা লম্বা ছুরি নিয়ে রেল ইয়ার্ডের জঙ্গলে লম্বা এক লাফ

যেয়ে রেল লাইন পার হয়ে পুরনো মাল গাড়ির কামড়ায় পেছনে হারিয়ে গেল। মাত্র দু মিনিটের মধ্যেই ঘটে গেল সব কিছু। ভগবানের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। উনি মাথা নিচু করে পার্সিবাবাকে দেখতে লাগলেন, পার্সিবাবা তখন মারা গেছেন। ওঁর চোখ খোলা, ব্যাগও খোলা পড়ে রয়েছে। ব্যাগের ভেতর মিষ্টির ঠোঙা দেখা যাচ্ছে। হয়ত এই মিষ্টি উনি নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন।

দূর থেকে মোটর গাড়ি আসার আওয়াজ শুনতে পেলাম। বিস্মিত তথা কিং-কর্তব্যবিমূঢ় ভগবানকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "চলো এখনই পালাই এখান থেকে। নইলে পুলিশ আমাদের ধরবে!"

"কিন্তু এই খুন···এই মৃতদেহ · এই নির্দোষ···এর বাচ্চাদের।"

"চলো পালাই, পালাই এখন" ভগবানকে টানতে টানতে বললাম, "নইলে আমাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করবে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা এ গলি সে গলি হয়ে দৌড়তে দৌড়তে ট্রাম টার্মিনালের গোল চত্বরে গিয়ে পৌছলাম। আলো ঝলমল করছে এখানে। সুমধুর হাওয়া, সুন্দরী রমণী ও সরল শিশুর উপস্থিতিতে এই পরিবেশ পরিপূর্ণ। বাস, লরি, অন্য গাড়ি আসা যাওয়া করছে, ঘণ্টা বাজিয়ে দোতলা ট্রাম যাত্রীদের নিয়ে চলে যাচ্ছে।

তারপর সব যখন অন্ধকার হয়ে গেল। একে একে সমস্ত জাগ্রত চোখ বন্ধ হয়ে গেল, আমি ভগবানকে বললাম। "তুমি যদি এই খুনকে সহ্য করতে পারো তাহলে তুমি ভগবানই নও···"

"তাহলে আমি কি?"

"তা আমি কি করে বলি। কিন্তু এই খুনের ঘটনাকে নিজের আত্মার সামনে রেখে বল তো তুমি কি?"

ভগবান ভাবতে লাগলেন। "মাঝে মাঝে আমার এই রকম মনে হয়, যেন আমি নিজেই জানি না, আমি কি বা কে। কখনো মনে হয় আমি একটা আগুন, শক্ত পাথরের চাঁই যা ভেঙে লাভার মতো বয়ে গেছে। জঙ্গলের মানুষ তাকেই ভয় পেয়ে ভগবান মনে করে পূজো করছে। তারপর আমি হলাম জল, সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে তটের ওপর আছড়ে পড়েছি, লোকে ভয়ে আমাকে দেখে পিছিয়ে গেছে। তারপর আমি হলাম সূর্য। মেঘের অন্ধকার ভেদ করে সোনালী রোদ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছি।···কখনো আমি একটা গাছ···কখনো একটা সাপ··· কখনো একটা পাথরের স্তূপ ··আমার এতো নাম, এতো বাসনা, আমাকে ঘিরে

এতো ভয়। তারপর মানুষ ভয়কে জয় করল। আমিও অনেক ওপরে উঠে গেলাম। আমি গাছ, পাথর, জল থেকে মহাশূন্যে পালিয়ে গেলাম, এবার আমি রূপ, স্থান, অবয়ব, নাম বিহীন কেবল এক শক্তি। মাটি ও আকাশ থেকে অনেক ওপরে·· দূরে···বহু দূরে সিংহাসনের ওপর বসে আছি। তারপর একদিন হঠাৎ মানুষ তার ছোট ছোট হাত দিয়ে মহাশূন্যে একটা বল ছুঁড়ে দিল আর সেই বল আকাশ ও ভূমির দূরত্ব মাপতে মাপতে, চন্দ্র সূর্য পরিক্রমা করতে করতে, তারামণ্ডল অতিক্রম করে আমার সিংহাসনে গিয়ে ধাক্কা মারল। আমার সিংহাসন দুলতে লাগল। আমি ভাবতে লাগলাম, আমি কি?"

"তারপর তুমি কি ভাবলে নিজেকে? দাদরের এই অন্ধকার বস্তির ঘরে শুয়ে আজ তোমাকে তোমার প্রকৃত পরিচয় জানাতে হবে। আজ খুনি এবং আহত দুয়ের মুখই তোমার সামনে উপস্থিত। আর জীবনে মৃতদেহের থেকে রহস্যময় বস্তু আর কি আছে। অপাপবিদ্ধতায় চুঁইয়ে পড়া ক্ষতর ওপর হাত রেখে তোমাকে বলতে হবে তুমি কে? কল্পনার শেষ সীমা, নাকি নভশ্চরের শেষ লক্ষ্য, নাকি বুদ্ধির শেষ বিন্দু?"

ভগবান মাথা নিচু করে অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, "আমি মানুষ।"

কথাটা শোনার পর অনেকক্ষণ আমার মধ্যে নীরবতা বিরাজ করতে লাগল, আমি ভাবতে লাগলাম, আচ্ছা সত্যিই কি ভগবান মানুষ?—মানুষ? তার মানে খুনি ও আক্রান্ত। ভ্রমর আবার ফুলও। বার্ধক্য এবং যৌবন। জীবন এবং বলিদান। হৃদয় আবার সখ্যতা। ঘৃণা আবার শত্রুতা। সভ্যতা আবার অসভ্যতা, দেবদূত আবার শয়তান, মানুষ।

তার মানে মানুষ যতোটা উঁচু, তিনিও ততোটা উঁচু। মানুষ যতোটা নিচু তিনিও ততোটা নিচু। মানুষের মতোই তাঁর অসীমত্ব, তাঁর সীমা ততোটাই গভীর যতোটা মানুষের। এ কথা কি সত্যি মানুষ তার প্রতিবিম্বে ভগবানকে দেখে?—মানুষ! এক অতি সাধারণ মানুষ?—আর যে ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের সৃষ্টি সেই ব্রহ্মাণ্ডই যদি লুপ্ত হয়, তাহলে ভগবানও কি মরে যাবে?

প্রকৃতির সাম্রাজ্যে আইন থাকবে না, আলো সেই গতিতে আর দৌড়বে না? শূন্যে আর বাতাস ভেসে যাবে না?

আর এই যে পদার্থ নির্মিত প্রকৃতি,—বলা হয় এর ঠিক বিপরীতে যে এক ব্রহ্মাণ্ড আছে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সেই ব্রহ্মাণ্ডে বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের অস্তিত্ব আছে। সেই সূক্ষ্ম লোক কেমন? তাদের ভগবান কি এক সূক্ষ্ম অপদার্থের প্রতিবিম্বে প্রস্তুত? আমি এ কথাও শুনেছি পদার্থ ও সূক্ষ্ম অপদার্থের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব ঘটে তখন অবশিষ্ট

কিছুরই অস্তিত্বই থাকে না। যখন কিছু আর বাঁচে না, তখন কি হয়? ঐ পূর্ণ অশেষের অবস্থায় কি হয় ভগবান? আমায় তুমি সব কিছু বলো না কেন ভগবান? মানুষ আজ পর্যন্ত যেটুকু জেনেছে, তুমি আমাকে শুধু সেটুকুই বলেছ। কিন্তু আমি এর থেকেও বেশি জানতে চাই···এর থেকেও আরো বেশি কিছু জানার আছে কি?···আজ তো এখন আর কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। এখন গভীর, নীরব, অন্ধকার রাত। চারদিক নিস্তব্ধ, কোথাও কেউ কিছু শুনতে পাবে না। আজ আমাকে শেষ সত্য জানিয়ে দাও।"

চারদিক এখন নিস্তব্ধ, নীরব। প্রকৃতির নাড়ি যেন মাঝে মাঝে থেমে থেমে যাচ্ছে।···ভগবান আমার কাছে শুয়ে রয়েছেন। ওঁর মুখের ওপর সরল হাসি ছড়িয়ে রয়েছে। যেন শিশু মায়ের দুধ খেয়ে স্বপ্ন দেখে মুচকে মুচকে হাসছে।

পরের দিন ভগবান আমাকে বললেন, "আমি স্বর্গে ফিরে যাবো। তুমি আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে এসো···"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "এরোপ্লেনে করে তুমি স্বর্গ পর্যন্ত যাবে?"

"না", ভগবান বললেন, "প্লেন উড়তে শুরু করলে আমি লাফিয়ে প্লেনের ডানায় উঠে বসে পড়ব। তারপর প্লেন যেই ওপরে উঠে যাবে তখন আর আমার ওখান থেকে স্বর্গে যেতে কোন অসুবিধে হবে না। ফরেন এক্সচেঞ্জ-এর ঝামেলা তো কেবল মানুষের পৃথিবীতেই রয়েছে।"

"কবে যাবে?"

"সন্ধ্যের মধ্যেই চলে যাবো। আরো কিছু বাচ্চা দেখব।"

"বাচ্চা দেখে এখনো মন ভরেনি?"

"না ভাই, আজ পর্যন্ত সেরকম বাচ্চা দেখলাম কোথায়, যাকে দেখতে এখানে এসেছি। আজ শেষ দিন। দেখা যাক হয়তো আজই দেখা পেয়ে যাবো।"

"সেরকম বাচ্চা তুমি হয়তো বোম্বাই শহরে পাবে না। সেরকম বাচ্চা আছে কোথায়···? আমি তোমাকে কি করে দেখাব? তুমিও কেমন সরল মানুষ ভগবান! পবিত্রতার যে প্রতিবিম্ব তুমি হৃদয়ে নিয়ে এসেছ, তা যদি আমাদের সমাজে না থাকে, তাহলে আমাদের জীবনে কোথা থেকে সেটা পাবে তুমি?"

"একটাই তো সম্পত্তি আছে তোমার কাছে, তোমার শিশু। একটাই সম্পত্তি আছে দেশের কাছে, তার শিশু। কিন্তু তোমরা তাকে এভাবে নষ্ট করছ কেন?"

"লোকে সম্পত্তি সুদে খাটায় না! তার থেকে লাভ করে না? বাচ্চাগুলোকেও যদি আমরা বোম্বাইয়ের লাভের চাকার সঙ্গে বেঁধে দি, তাহলে ক্ষতি কি?

এতে তোমার আশ্চর্য হবারই বা কি আছে ?
স্বর্গে ফিরে যাও। যেমন বাচ্চা চাইছ, ওরকম বাচ্চা তুমি পাবে না এখানে।"
"পাওয়া যাবে। আজ সন্ধের মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যাবে। আমি ওকে অবশ্যই খুঁজে বার করব। চলো, তোমার ঝুপড়ি থেকে বেরোন যাক।" ভগবান অস্থির হয়ে উঠে বললেন, "আমরা এ কদিন বড্ড ভুল করে এসেছি! আজ আমাদের আরো ছোট বাচ্চা ছেলে সাজতে হবে। ছ বছর বয়সের বাচ্চা ছেলে।
ইচ্ছে করলে তুমি দুগ্ধপোষ্য শিশুও হতে পারো।"
"তা হতে আমি বারন করেছি নাকি। তবে আমাকে আরো ছোট বাচ্চা করে দিও না, যাতে দু পায়ে হেঁটে আমি নিজের ঘরে ফিরে আসতে না পারি।" অনুরোধ করলাম আমি।
"তোমাকে আট বছরের বাচ্চা করে দিচ্ছি আর আমি দশ বছরের বাচ্চা হয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে ?" ভগবান জিজ্ঞেস করলেন।
"তোমার যা ইচ্ছে", আস্তে আস্তে বললাম আমি।
সারাদিন আমরা বোম্বাইয়ের গলিতে বাজারে ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। অন্ধ গলির পেছনে, ঝুপড়িতে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও আমরা ঐ ধরনের শিশুর দেখা পেলাম না। শেষে সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় আমাদের শরীর যখন অবসন্ন, তখন বোরি বন্দরের ডক ইয়ার্ডে বছর সাতেক বয়সের একটা খোঁড়া ছেলেকে দেখতে পেলাম আমরা। ছেলেটার পরনে ময়লা জামাকাপড়। পয়সা গুনতে-গুনতে খুশি মনে চলে যাচ্ছে সে। মুখে তার অত্যন্ত মনোরম খুশির চমক। এমন পরিতৃপ্ত মুখাবয়বের শিশুটিকে দেখে ভগবান চমকে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক লাফ মেরে ওর পাশে গেলেন।
"তোমার নাম কি ভাই ? ওকে জিজ্ঞেস করলেন ভগবান।
"ভিকু।"
"কি কাজ করো ?"
"ভিক্ষে করি।"
"লজ্জা করে না ?"
"লজ্জা কিসের ?...এই দেখ..." খোঁড়া বাচ্চাটা পয়সা ভর্তি হাতের মুঠো সামনে এগিয়ে ধরে খুশিতে চিৎকার-করে উটল "পয়সা...পয়সা...পয়সা।"
ভগবান যেমন সামনে লাফিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি লাফিয়ে পেছনে চলে এলেন। যেন একটা সাপ বা বিছে দেখতে পেয়েছেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,

"তোমরা ভাই বোন কটা ?"

"আমরা কুড়িজন ভাই বোন।"

"সবাই আপন।"

"আপনই ধরো। আমাদের কুড়িটা বাচ্চার একটা ঘর। আমরা সবাই এক জায়গাতেই থাকি।"

"তোমাদের বাবার কাছে ?"

"না আমাদের দাদার কাছে। ও আমাদের দেখাশোনা করে। আমাদের দুবেলা রুটি দেয়, পরনের কাপড় দেয়, থাকার ঘর দেয়। কখনো কখনো আমাদের সিনেমা দেখায়। ওর কাছে আমরা খুব সুখে আছি।

ভগবান আমার দিকে আশার নজরে তাকালেন।

তারপর ঐ খোঁড়া ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের দুজনকেও তোমাদের সঙ্গে নেবে ?"

"ভিকিরিদের সঙ্গে থাকবে ?" আমি বিরক্তি প্রকাশ করে বললাম।

"কেন, তাতে কি অসুবিধে আছে। এমন সুখী সন্তুষ্ট বাচ্চা আমি আজ পর্যন্ত বোম্বাই শহরে দেখিনি। আর একটা নয়, একসঙ্গে কুড়িটা বাচ্চা যেখানে আছে আমি নিশ্চয়ই সেখানে থাকতে চাইব।"

"বলতে পারি না, দাদা তোমাদের রাখবে কি রাখবে না। তবে আমি তোমাদের নিয়ে যেতে পারি। একটা কথা বলে রাখি···আমাদের এই দাদা বড্ড কড়া লোক। ওঁর প্রতিটি আদেশ তোমাদের মেনে চলতে হবে।"

"ঠিক আছে," ভগবান মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন।

আমি ভগবানকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ভগবান নিজের জেদ ধরে বসে রইলেন। তারপর আমরা দুজনে খোঁড়া ছেলেটার সঙ্গে যেতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ এ গলি, সে গলি, এ রাস্তা হয়ে ঠিক সন্ধেবেলা অন্ধকার যখন ঘন হলো, তখন এক বিচ্ছিরি দুর্গন্ধযুক্ত নালার পাশের ঝুপড়িতে যেয়ে উঠলাম আমরা। জং লাগা টিনের ঘর, পুরোনো কাঠের জানলা দরজা। ছেঁড়া তেরপল আর বস্তার ছাদ। ধোঁয়া, অন্ধকার, দুর্গন্ধ, ময়লার পরিবেশে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। ছেলেটা আমাদের ঐ বস্তিগুলোর মাঝে একটা উঠোনে নিয়ে গেল। সেখানে রোগা, খোঁড়া, কানা ছেলে মেয়েরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর একজন একজন করে এক মোটা স্বাস্থ্যবান কালো লোকের হাতে তাদের সারা দিনের রোজগারের হিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছে।···এই লোকটাই মনে হয় এদের দাদা। ঐ লোকটার ঠিক পেছনে দুটো গুণ্ডা দাঁড়িয়ে আছে। তারা বাজ পাখির

মতো তেজি দৃষ্টিতে বাচ্চাগুলোকে দেখছে।

হঠাৎ ঐ দাদা একটা বাচ্চা মেয়েকে চটাস করে একটা থাপ্পর মারল। "আজ দশ পয়সা কম এনেছিস কেন ?..."

বাচ্চা মেয়েটা থাপ্পড় খেয়ে একটা বাচ্চা ছেলের গায়ে গড়িয়ে পড়ল। দুজনে কাঁদতে লাগল।

"বার কর বাকি দশ পয়সা।"

"আমার কাছে নেই," ভয়ে ভয়ে মেয়েটা বলল।

দাদার চোখের ইশারায় তার এক সহকারী মেয়েটাকে মেরে মেরে ওর মুখ থেকে দশটা পয়সা বার করিয়ে ছাড়ল। ও পয়সাটা জিভের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল।

এবার আর একটা বাচ্চা কাঁপতে কাঁপতে সামনে এগিয়ে এলো।

অন্য এক কোণে কয়েকটা ভিখিরি মেয়েছেলে নোংরা ময়লা পোশাক পরে, সেই রকমই নোংরা পরিবেশের মধ্যে বসে রান্না করছে। এদিকের ঘটনা প্রবাহ তাদের অনুভূমিতে কোন রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে না।

এবার ভিকুর পালা। আমরা দুজনে ভয়ে ভয়ে ওর পেছন পেছন যাচ্ছি।... ভিকুর রোজগার দেখে দাদা খুব খুশি হলো।

বলল, "সাবাশ ! কাল যদি তুই এরকম পয়সা রোজগার করতে পারিস, তাহলে পরশু তোকে সিনেমা দেখাব।"

ভিকু খুশি হয়ে বলল, "দাদা আমার দুজন বন্ধুকে সঙ্গে এনেছি। এরাও আমাদের সঙ্গে বস্তিতে থাকতে চায়।"

ভিকু হাত ধরে আমাদের দাদার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল।

দাদা বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমাদের দেখতে লাগল। তার চোখের দৃষ্টি অতি ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণ।...একটু পরেই কর্কশ কণ্ঠে সে বলল, "তোমাদের মা বাবা কোথায় ?"

"মারা গেছে," আস্তে আস্তে বললাম আমি।

ভগবান চুপ করে রইলেন।

"আমাদের দলে ভিড়তে চাও ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ !" কাতর কণ্ঠে ভগবান বললেন।

"যা বলব, তাই করতে হবে।"

"ঠিক আছে," আমি বললাম।

"যেভাবে রাখব, সেভাবে থাকতে হবে।"

"ঠিক আছে," ভগবান বললেন।
"ভিকু এদের নিয়ে গিয়ে খেতে দাও। আজ মাঝ রাতে ওদের দলে ভিড়িয়ে নেওয়া হবে।"
খেতে বসে আমি ভিকুকে জিজ্ঞেস করলাম, "মাঝ রাতে কি হবে?"
"সে মাঝ রাতেই জানতে পারবে", ভিকু মুচকি হেসে রহস্যময় কণ্ঠে বলল।
মাঝ রাত্তিরে ঘুমে যখন আমাদের চোখ বুঁজে আসছে, আর অন্ধকার ময়লা, গা-গুলনো পরিবেশে ফিস ফিস করে আমরা কথা বলছি, তখন ভিখু আমাদের হাত ধরে টেনে বলল, "ওঠো দাদা ডাকছে।"
"এখন কি হবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"তোমাদের দুজনকে দলে নেওয়া হবে।"
"কি ভাবে", জিজ্ঞেস করলেন ভগবান।
"আমার মতো এর পা ভেঙে দেওয়া হবে", ভিকু হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল।
"আর দাদা বলছিল তুমি...(ভগবানকে ইশারা করে) তোমাকে দেখতে বড় সরল, নিষ্পাপ। তাই তোমার চোখ দুটো গেলে দেওয়া হবে।"
"ওর পা ভেঙে দেওয়া হবে?...কেন?" ভগবান ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন।
কারণ লোকে স্বাস্থ্যবান বাচ্চাদের ভিক্ষে দেয় না। সুস্থ সবল সম্পূর্ণ শিশুর প্রতি কেউ দয়া দেখায় না। তবে হ্যাঁ...যদি কোন বাচ্চার পা ভাঙা হয় বা হাত না থাকে, বা যদি অন্ধ হয়, তাহলে লোকে তাদের দেখে দুঃখ পেয়ে পয়সা দেয়। এই ধরনের ভিকিরি বাচ্চারা প্রচুর রোজগার করে। সে জন্যই তোমাকে অন্ধ করা হবে আর ওর পা ভেঙে দেওয়া হবে। তারপর তোমাদের আমাদের দলে নিয়ে নেওয়া হবে।"
"না ভাই, এমন দলে আমি ভিড়তে পারবো না।" ভগবান চোখের ওপর হাত রেখে বললেন।
"বোকার মতো কথা বলো না...", ভিকু আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করল, "একটু কষ্ট হবে, সামান্য রক্ত বেরোবে, এই যা। কিছুদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর তোমরাও আমাদের মতো প্রতিদিন প্রচুর পয়সা রোজগার করতে থাকবে। চলো...আর দেরি করো না...দাদা তোমাদের ডাকছে।"
"না, না, আমরা দাদার কাছে যাবো না," ভগবান যেতে রাজি হলেন না।
"চলো পালাই এখান থেকে," আমি ভগবানের হাত ধরে বললাম।

আমরা যেই পালাতে গেলাম, অমনি আশেপাশে হৈ হল্লা শুরু হয়ে গেল।
অন্ধকারে 'ধর'— 'ধর'—'পালাচ্ছে' কথাগুলো শুনতে পারলাম।
অন্ধকারে ভগবানের সঙ্গে আমার হাত ছাড়া ছাড়ি হয়ে গেল। আমি একটা লাফ মেরে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে উঠোনের বাইরে চলে এলাম। ভগবান ওখানেই রয়ে গেলেন।
আমি এক কোণে পুরনো একটা কাঠের দরজার আড়ালে লুকিয়ে থেকে উঠোনের দিকে দেখতে লাগলাম।···
দেখি ভগবান জোরে জোরে চিৎকার করছেন আর দুটো গুণ্ডা ওঁকে চেপে ধরে দাদার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। দাদা জ্বলন্ত উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে একটা লোহার শলা গরম করছে।
ঐ গুণ্ডা দুজন ভগবানকে ঐ উনুনের কাছে নিয়ে গিয়ে মাটির ওপর শুইয়ে দিল। একটা গুণ্ডা ভগবানের হাত দুটো ধরে রাখল, আর একজন পা দুটো। এবার দাদা হা হা করে অট্টহাসি হেসে উঠে লোহার শলাটা উনুন থেকে বার করল···
হঠাৎ এক তীব্র আর্তনাদ শুনতে পেলাম। আমি চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললাম। যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ আমার কানে এসে লাগল।

আমি দেখেছি···আমি দেখেছি···
লোকে বলে এসব মিথ্যে কথা। ভগবান নাকি আমার কাছে কখনো আসেননি। আমার সঙ্গে কথাও বলেননি। আমি নাকি তাঁকে নিয়ে বোম্বাইয়ের গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াইনি। এসব মিথ্যে কথা, বানানো গল্প। এ সব আমার কল্পনার সৃষ্টি। আজ পর্যন্ত আমি নাকি ভগবানকে কখনো দেখিইনি।
লোকে যে যাই বলুক, আমি একটা কথা শপথ করে বলতে পারি, আমি ভগবানকে দেখেছি, আমি ভগবানকে অবশ্যই দেখেছি। হয়তো আপনারাও দেখেছেন, তবে চিনতে পারেন নি।
জীবনে শেষ বারের মতো আমি যখন ভগবানকে দেখলাম তখন তিনি ছ বছরের এক অন্ধ দুর্বল শিশু, সন্ধের লাল সূর্যালোকের প্রেক্ষাপটে দু হাত ছড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি পুলের ওপর দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইছেন।

আলুচে

পঁচিশ বছর পর জগমোহন পহলগাঁওয়ে এসেছে। এই পঁচিশ বছরে পৃথিবী কতো পালটে গেছে। ও নিজেও তো বদলে গেছে কতো। আগে ও দিনে একবার শেভ করত। এখন ও অনুভব করে দিনে দুবার শেভ করা দরকার। নিজের জামা-কাপড়ের ব্যাপারে আগে ও কেমন বেপরোয়া ছিল। ওর মনে পড়ে, ও যখন প্রথম পহলগাঁওয়ে এলো, আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে, তখন ও কেবল একটা জামা আর পাজামা পরে ঘুরে বেড়াত। ওর চওড়া কপাল, চওড়া বুক দেখে মেয়েরা লজ্জায় মুখ নিচু করে নিত। কিন্তু এখন সে বুক ভেতরে ঢুকে গেছে, সে গাল বসে গেছে। কপালের ওপর অজস্র বলিরেখা উঠেছে ভেসে। এখন পাতলা চুলের সাদা রং লুকোবার জন্য ওকে কলপ লাগাতে হয়। এখন ও কেবল জামা আর পাজামা পরে ঘুরে বেড়াতে পারে না। যাতে ওর অজানা রোগের শিকার শরীরের কুঁজ কেউ দেখতে না পায়, সে জন্য ও কোট প্যান্ট টাই পরে ঘুরে বেড়ায়। পঁচিশ বছর আগে ওর শরীর থেকে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের সুবাস ছড়াত। এখন ওকে রাসায়নিক সুগন্ধের সাহায্য নিতে হয়। ও নিজে কেমন বুড়ো হয়ে গেছে। অথচ এই পহলগাঁও এখনো সেরকম তরুণ যুবকই রয়ে গেছে। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে যেমন দেখে গেছে ও, তেমনই সুন্দর, পরিপূর্ণ যৌবনে রয়ে গেছে পহলগাঁও।

আশ্চর্য সুন্দর পহলগাঁও উপত্যকা। মুক্তোর মতো চকমকে, কাচের মতো ঝকঝকে নদী। এই নদীর ঝকমকে বিশুদ্ধ জল, মাঝে মাঝে কেমন নীল ; যেন কেউ ওতে মিশিয়ে দিয়েছে আকাশের নীল রং। মাঝে মাঝে কেমন সবুজ, যেন চির গাছগুলো তাদের সমস্ত রস নিংড়ে মিশিয়ে দিয়েছে ওতে। মাঝে মাঝে এই নদীর ঢেউগুলো এক একটা পাথরকে ঘিরে এমনভাবে ঘুরছে, মনে হচ্ছে যেন গোপিনীরা শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে কথাকলি নাচ নাচছে। পূব দিকে পাহাড়ের গায়ে উঁচু উঁচু দেবদারু গাছগুলো দুচোখে শতাব্দীর গর্ব নিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখছে। আর তাদের ছড়ানো সবুজ হাতগুলো জঙ্গলের মধ্যে চারদিক থেকে নিজের বুকে আলো টেনে নিচ্ছে। সূর্যের আলো বহু দূর থেকে আসছে আর চির, দেবদারু পাইনের ছায়ায় ঘরের বধূর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতিটি পাতা যেন সূর্যের আলোর ঘর। আলোই ছায়ার জন্ম দিয়েছে। জঙ্গলে চার দিকে কেবল নিস্তব্ধতা এবং ছায়া। মাঝে মাঝে ঘন জঙ্গলের মধ্যে থেকে কেবল আলো দেখা যাচ্ছে। সেসব জায়গা দিয়ে সূর্যের লক্ষ লক্ষ কিরণ মাটির দিকে ধেয়ে আসছে। সেগুলো আলোর ঝর্ণাধারার মতো লাগে। আহা ! কি সুন্দর পহলগাঁও—সবুজ, সুন্দর, মাদকতায় পূর্ণ উপত্যকা। এখানকার প্রতিটি মুহূর্ত

প্রস্ফুটিত ফুলের মতো বিকশিত, প্রেয়সীর স্পর্শের মতো মোহময় মাদকতায় পরিপূর্ণ। 'এই তো আমার সেই বাল্যকালের সুন্দর পহলগাঁও। পঁচিশ বছরে পৃথিবী কতো পালটে গেছে। আমি কতো বদলে গেছি। কিন্তু এই পহলগাঁও বদলায়নি'—জগমোহন ভাবল।

জগমোহন একবার তার স্মৃতির আকাশে ফেলে আসা পঁচিশ বছরের দিকে তাকাল। দু চোখের সামনে কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কবর ও ধ্বংসের ছবি ভেসে উঠল। সেই কবরের পটভূমিতে কারখানার চিমনির ধোঁয়া উঠছে। আগে একটা কাপড়ের মিল ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দুটো হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চারটে হলো। লক্ষ লক্ষ মানুষের কবরের ওপর একটা চিমনি তৈরি হয়। ওর নিজের ইওরোপ সফরের কথা মনে পড়ে গেল—প্যারিসের মদের দোকান, রোমের গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ানো ইটালির সুন্দরীরা, বার্লিনের রেস্তোরাঁর প্রতিটি টেবিলে একটা করে টেলিফোন, আর প্রতিটা টেলিফোনের সঙ্গে একটা করে কল গার্লের কানেকশন। টেলিফোন তোল অমনি কলগার্ল হাজির। জগমোহন সারা পৃথিবী দেখেছে। সাংহাইয়ের ক্যাবারে আর বুয়েন্সআয়ার্স-এর উপত্যকায় নারকেল গাছের মতো লম্বা, স্প্যানিশ সঙ্গীতের মতো উত্তেজক মহিলা, মাতাল করা মদ, আর সুন্দর নাচ। মুর সুন্দরীদের চুলের লকেটের মতো নারকেল গাছের ওপর চাঁদ। আহা! এই পৃথিবী কতো সুন্দর।

এই পঁচিশ বছরে জগমোহন প্রাণ ভরে সুখ ভোগ করে নিয়েছে। দিল খুলে শরীর ও পয়সা খরচ করেছে। একথা সত্যি, সে পয়সা হয়তো ক্ষয়ে যায়নি, কিন্তু ওর শরীর ক্ষয়ে গেছে। ওর আয় বেড়েছে, ইনকামট্যাক্সের চাপ বেড়েছে। তারই মধ্যে হাজার বেইমানি করে ও নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ঠিক বাড়িয়ে নিয়েছে। কখনো খরচ কাট-ছাঁট করে, কখনো হিসেবে গোলমাল করে নিজের খরচ বাঁচিয়ে গেছে। পয়সা নষ্ট হতে দেয়নি, কিন্তু শরীর নষ্ট হয়ে গেছে। এখন ও টনিক খেয়ে, ইনজেকশন নিয়ে, হাজার রকমের উত্তেজক ওষুধ খেয়ে শরীর চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করে। এই চেষ্টা একদিক থেকে ওর শরীরের সঙ্গে বেইমানি। ও জানে প্রতিটি উত্তেজক ওষুধ শেষ পর্যন্ত ওর শরীরকে দুর্বল করে। কিন্তু যতোদিন প্রাণ আছে, ততোদিন নিজের টাকা পয়সা আর শরীরের মাধ্যমে ফুর্তি করে নিতে আপত্তি কোথায়। মরার পর স্বর্গে তো কেবল গরীবরাই যায়।

জগমোহন উঠে দাঁড়াল। যে দেবদারু গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসেছিল, সেই গাছটা ধরেই উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াবার উদ্দেশ্য, নিচের রাস্তা দিয়ে এক-

কাশ্মিরী যুবতীকে মাথায় ফলের ঝুড়ি নিয়ে হেঁটে যেতে দেখতে পেল। ও দুনিয়ার সব ধরনের সুন্দরী নারী দেখেছে, ইটালিতে বরফের থেকেও দাগ বিহীন শরীরের রমণী, ইস্তাম্বুলের শরাবখানায় নৃত্যরত তুর্কী সুন্দরী, প্রতিটি দৃষ্টিতে শ্যাম্পেন ছলকানো, সাদা ফুল দিয়ে শৃঙ্গার করা, নিজের রূপে রঙে দুই মহাদেশের সৌন্দর্য নিয়ে হাওয়াই দ্বীপের অর্দ্ধনগ্ন রূপসীরা, কতো রকমের রূপ ও দেখেছে! কিন্তু কাশ্মীরের রূপের জবাব নেই! পদ্মের মতো সাদা আবার গোলাপের মতো শুভ্র; চাঁদের মতো সজল আবার সূর্যের মতো স্মিতহাস্য মুখর; কাশ্মীরের চোখ কখনো ঝিলের মতো শান্ত আবার মনে হয় রহস্যময়ী, কখনো আবার ঝর্ণার মতো খিল খিল করে মনের যাবতীয় ভাবনা প্রকাশ করে ফেলে। কাশ্মীরের বুক কখনো বরফের মতো শীতল, স্পর্শ করা যায় না, আবার কখনো আগুনের মতো ধক ধক করে জ্বলে, যেন ছুঁলেই এখনি আগুন লেগে যাবে জঙ্গলে। নিজের অন্তরে এত মিল অমিল নিয়ে যে রূপ সে রূপ কাশ্মীর ছাড়া অন্য কোথাও দেখেনি সে। তাই তো এতো বছর পরে পহলগাঁও ওকে আবার কাছে টেনে এনেছে।

মাথায় ফলের ঝাঁকা নিয়ে ঢালু পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক কাশ্মিরী যুবতীকে দেখে পঁচিশ বছর আগেকার একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর।

একদিন পহলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি যাবার পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ও। ঘুরতে ঘুরতে ও অনেক দূর চলে গিয়েছিল। প্রকৃতিতে তখন মনোরম রোদের বাতাবরণ। পথ চলতে চলতে ওর দেহ যখন গরম হয়ে উঠছিল, তখন হঠাৎ হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়ায় ওর শরীর এমন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল, যেন কোন শিল্পীর ব্রাশ ছবির ফালতু রং মুছে দিচ্ছে। ও গুন গুন করে একটা গানের কলি ভাঁজতে লাগল। এমন সময় একটা মেয়েকে দেখতে পেল ও। মেয়েটা মাথায় ফলের ঝাঁকা নিয়ে পহলগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিল। মেয়েটা ওর কাছে এসে মুচকি হাসল। ও-ও মুচকি হাসল। মেয়েটা ফলের ঝাঁকা নিচু করল, ও-ও মাথা নিচু করল।

"খুবানী মিষ্টি ?" ও জিজ্ঞেস করল।

"দেখ না।"

ও মেয়েটার গভীর চোখের দৃষ্টিতে হারিয়ে গেল।

মেয়েটা ঝাঁকা থেকে একটা খুবানি তুলে ওকে দেখিয়ে বলল, "একদম পাকা রসালো ফল। এর রং দেখ—সোনালী, গায়ে একটাও দাগ নেই।"

ও ঐ মেয়েটার হাতের গোলাপী, বেদাগ চামড়ার কোমলতা অনুভব করতে

লাগল।
"খুব সস্তা। মাত্র দু টাকা ঝাঁকা। এক ঝাঁকা নিয়ে নাও।"
পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বার করল ও। মাটিতে বিছিয়ে দিল রুমালটা। বেছে বেছে দু ডজন খুবানি রাখল ওর ওপর। আট আনা পয়সা দিল মেয়েটাকে।
খুশিতে বিস্ময়ে মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "আট আনা পয়সা তো অনেক ; আরো কয়েকটা নিয়ে নাও।"
"পরে আবার নিয়ে যাবো। তুমি থাকো কোথায় ?"
পেছন দিকে ইশারা করে মেয়েটা বলল, "রাস্তার ঐ মোড়ে আমার বাড়ি। খুবানী আমাদের বাড়ির গাছের। আমাদের বাড়িতে চারটে খুবানি গাছ আছে।"
"আমি একদিন তোমার বাড়ি যাবো। নিজের হাতে গাছ থেকে খুবানি পেড়ে খাবো।"
"এসো না।" খিল খিল করে হেসে উঠল মেয়েটা।
মেয়েটা নিজে হাতে ঝাঁকা মাথায় তুলতে গেলে জগমোহন দু পা এগিয়ে ওর মাথায় ঝাঁকা তুলে দিল। দুজনের হাতে হাত লেগে গেল। ঐ এক মুহূর্তের ছোঁয়ায় বহু যুগের যৌবন গুনগুন করে উঠল। যবে থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, যবে থেকে আগুন ঝলসে উঠেছে, যবে থেকে হৃদয় স্পন্দিত হয়েছে, যবে থেকে চোখের জল টপ টপ করে পড়েছে, তবে থেকে কতো লক্ষ কোটি বছরের সৃষ্টিশীল বাসনা একটি মুহূর্তে ছটফট করে উঠেছে। জগমোহনের হৃদয়ের গতি দুর্বার হয়ে উঠল। তবু ও অত্যন্ত সংযমের পরিচয় দিল। উলটো পথে এগিয়ে যেতে লাগল। ও চলে গেল চন্দনবাড়ির দিকে আর মেয়েটা পহলগাঁওয়ের দিকে। সামনের মোড়ে গিয়ে ও একটা কাঠের বাড়ি দেখতে পেল। বাড়ির একদিকে একটা ছোট টিলা। টিলার ওপর থোকা থোকা নার্গিস ফুল ফুটে রয়েছে।
এরপর এ বাড়ি ও কি করে ভুলতে পারে।
পরে বেশ কয়েকবার মেয়েটার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে। মেয়েটার কাছ থেকে ও খুবানি কিনেছে, আর প্রতি বারই খুবানি যতো নিয়েছে, দাম দিয়েছে তার থেকে বেশি।
একবার ও পহলগাঁও-এ বাজার থেকে একটা সিল্কের রুমাল কিনল। রুমালে কিশমিশ, বাদাম, আখরোট রাখল। তার ওপর দশ টাকার একটা নোট রাখল। রুমালটা ভালো করে বেঁধে একটা বাচ্চা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তার ঐ মোড়ের বাড়িটা দেখিয়ে বলল—

"মেয়েটা যেই কোন কাজে বাইরে বেরোবে অমনি রুমালটা ওর হাতে দিও। ও তোমাকে যা বলবে আমাকে এসে জানিও।"

এ কথা বলে জগমোহন নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে ছেলেটার অপেক্ষা করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পরে ছেলেটা ফিরে এলো সেই সিল্কের রুমালটা ওর হাতে আগের মতোই রুমালটা ভর্তি। জগমোহনের বুক ধক ধক করতে লাগল। ছেলেটা ওটা দোলাতে দোলাতে আসছিল। সঙ্গে গাইছিল গান। গানের অর্থ হলো, যখন বসন্ত আসে তখন চিনারের পাতা প্রেয়সীর কপালের মতো লাল হয়ে ওঠে।

"ধুর হারামজাদা", জগমোহন মনে মনে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, "সে রুমাল ফিরিয়ে দিল আর এ শালা গান গাইছে।"

ছেলেটা তাঁবুর ভেতরে এসে জগমোহনের হাতে রুমালটা তুলে দিল। দেখল রুমালের ভেতর না আছে দশ টাকার নোট, না বাদাম, না আখরোট…কেবল গোছা গোছা নার্গিস ফুল আর ফুল।"

ছেলেটা মুচকি হেসে বলল, "সাহেব বকশিস।"

ঐ মেয়েটার বাড়িতে সে দিনের রাত কতো মধুর কেটেছিল। কেমন খুশি মজা, ভালবাসায় ভরা ছিল। সে রাতের কথা মনে পড়তে জগমোহনের হৃদয় মদ মাতাল খুশিতে ভরে উঠল। ও দ্রুত পায়ে নিচের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া যুবতীটির দিকে এগিয়ে গেল।

যুবতীটি তার ফলের ঝাঁকা নিচু করল, জগমোহনও নিচু হলো।

ঝাঁকায় আলুবখরা।

"মিষ্টি?" জগমোহন জিজ্ঞেস করল।

"খেয়ে দেখ না।"

"খেয়ে দেখব?" জগমোহন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল।

কাশ্মীরী যুবতীর কপাল আপেলের থেকেও অনেক বেশি শুকিয়ে গেল। ওর কান লাল হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ", ও ধীর কণ্ঠে বলল। ওর সঙ্গে সাত আট বছর বয়সের একটা বাচ্চা ছেলেও রয়েছে। ছেলেটা বলল—

"সাহেবকে একটা আলুবখরা দাও।"

"এ কি তোমার ছেলে?"

"হ্যাঁ", যুবতীটি ছেলেটির মাথায় একটা হাত রেখে বলল।

"এর কি নাম?"

"কাদির।" ও গর্বের সঙ্গে বলল।
কাদির জগমোহনের দিকে তাকিয়ে নির্ভয়ে মুচকি হাসল।
জগমোহন একটা আলুবখরা খেয়ে দেখল। তারপর পকেট থেকে একটা সিল্কের রুমাল বার করল। রুমালের ওপর কয়েকটা আলুবখরা রাখল। যুবতীটিকে একটা টাকা দিল। আর বাচ্চাটাকে আট-আনা।
"এটা কিসের জন্য?"
"বাচ্চা ছেলে, মিষ্টি খাবে।"
"হ্যাঁ", কাদির বলল, "আমি মিষ্টি খাবো।"
আটআনিটা পকেটে ঢুকিয়ে নিল সে।
এক গোছা সোনালী চুল উড়ে এসে পড়ল যুবতীটির কপালে। হাত দিয়ে চুল পেছনে সরিয়ে দিতে দিতে ও বলল, "এই ঝাঁকাটা একটু তুলে দাও তো সাহেব।"
জগমোহন ঝাঁকা তুলল। যুবতীটির হাতে ওর হাত ঠেকে গেল। পঁচিশ বছর আগের সেই চারটে খুবানি গাছওলা বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল ওর। সে দিনের কথা মনে পড়লেও আজ আর তার শরীরের শিরায় শিরায় সে কাঁপন, সে শিহরণ, সে উত্তাপ সৃষ্টি হলো না। এই ছোঁয়া আর সেই পঁচিশ বছর আগেকার ছোঁয়ার মধ্যে আরো কতো হাজার হাজার যুবতীর হাতের ছোঁয়া ব্যবধান তৈরি করে রেখেছে, যারা পাউণ্ড, ডলার, দিনার, ফ্রাঙ্কের বদলে সর্বস্ব বিক্রি করতে নেমেছিল, দর দাম করেছিল।
কিন্তু এই দর দাম সব কিছু শেষ হবার পরও শুধু দর দামই থেকে যায়। কখনো সঙ্গীতের সৃষ্টি করে না।
ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে জগমোহন এই পরিণত যুবতীটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখল, পরখ করল, হিসেব করল। ভেবে দেখল এ কতোয় বিক্রি হতে পারে। তারপর অতি ধীরে মুচকি হেসে আলুবখরা খেতে খেতে হাঁটতে শুরু করল।
ও আস্তে আস্তে সে ঐ যুবতীটি থেকে কিছুটা দূরে দূরে কিন্তু ওকে নিজের দৃষ্টির মধ্যে রেখে এগোতে লাগল। মাঝে মাঝে যুবতীটিও পেছন ফিরে দেখছিল যে ও পেছন পেছন আসছে। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।
সন্ধে নাগাদ যুবতীটি তার আলুবখরা বিক্রি করে বাড়ি ফিরে গেল। কাঠের পুলের ওপারে মনোহরকুঞ্জে যুবতীটির ছোট কাঠের বাড়ি। বাড়ির চারপাশে ফুলের গাছ।
জগমোহন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুল দেখতে লাগল। তারপর ফিরে গেল।

তারপর আরো কয়েকবার যুবতীটির সঙ্গে দেখা হল। কয়েকবার ও যুবতীটির কাছ থেকে আলুবখরা কিনল। যুবতীটিকে আলুবখরার দাম দিল, আর কাদিরকে দিল মিষ্টি খাবার পয়সা।

কাদির জগমোহনের খুব ভক্ত হয়ে উঠল।

একদিন জগমোহন বাজার থেকে একটা কাশ্মীরী রুমাল কিনল। রুমালে কিশমিশ, বাদাম এবং আখরোট রাখল, তার ওপর রাখল একটা দশ টাকার নোট। তারপর রুমালটা শক্ত করে গিঁট দিয়ে বেঁধে কাদির হাতে দিয়ে বলল—"তোর মাকে দিবি। তোর মা যা যা বলবে, আমার তাঁবুতে এসে বলে যাবি।"

মুচকি হেসে কাদির বলল, "ঠিক আছে।"

সূর্য যখন লিডার নদীর ওপারে পাহাড়ে অস্ত যাচ্ছে, কাদির তখন তাঁবুতে ফিরে এলো। জগমোহন ইতিমধ্যে শেভ করে জামা-কাপড়ে সুগন্ধী লাগিয়ে তৈরী হয়ে নিয়েছে, নিজেই নিজের হাতে একটা ইনজেকশন ফুড়ে নিয়েছে। নিজের দিক থেকে তৈরি হয়ে একেবারে খোশ মেজাজে কাদিরের অপেক্ষায় বসে আছে।

কাদির রুমাল দোলাতে দোলাতে আসছিল।

রুমাল ভর্তি।

জগমোহন চোখে শুধু ফুল আর ফুলই দেখছে। ওর মনে হলো যেন কাশ্মীর কন্যা তার লজ্জানম্র নার্গিস চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছে।

ভর্তি রুমাল ওর সামনে এগিয়ে ধরল কাদির।

জগমোহন কাঁপা কাঁপা হাতে রুমাল খুলল।

রুমালে কিশমিশ নেই, আখরোট নেই, বাদামও নেই—আছে কেবল একটা ফাটা পুরনো রং চটা জুতো। জুতোর মধ্যে আধপোড়া ওর দশ টাকার নোটটা রয়েছে। জগমোহনের মনে হলো কেউ যেন ওর মুখে ঐ ফাটা জুতোটা ছুঁড়ে মারল। রাগে ওর গাল তেতে আগুন হয়ে উঠল।

রেগে আগুন হয়ে কাদিরকে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল ও—

"এসব কি?"

উত্তরে কাদির মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। তারপর একটু জোরে হাসল। তারপর শুরু করল আরো জোরে হাসতে। তারপর ও দৌড়তে শুরু করল। হাসতে হাসতে দৌড়তে দৌড়তে দূরে আরো চলে যেতে লাগল। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ঐ হাসি জগমোহনের কানে ঝন্ ঝন্ বাজতে লাগল।

নতুন কাশ্মীরের হাসি—!!

ভক্ত সুদামা

সাড়ে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে সুদামা যখন জেলের লোহার গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন উজ্জল রোদের আলোয় ও ছুচোখে ঝাপসা দেখছে। হাঁপাতে হাঁপাতে, ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে কয়েক পা সামনে এগিয়ে তেঁতুল গাছের নিচে পড়ে থাকা পুরনো তোপের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু পরে ও চোখ খুলে দেখল বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে আকাশ। আকাশের কোণে কোণে নারকেল গাছের সারি। নারকেল গাছের পাতাগুলোকে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ছুলতে দেখে মনে হচ্ছে যেন, সবুজ আঙুল দিয়ে কেউ আকাশের নীল ঢেউয়ের সঙ্গে খেলছে। এই খেলা সুদামার চোখে খুব ভালো লাগল। সূর্যের আলো যেমন জেলের জানালা ভেদ করে প্রবেশ করে, তেমনি ওর শ্যামলা রং-এর শুকনো ঠোঁটের ওপর হাসির ঢেউ খেলে গেল।

ও যেই ওখান থেকে হাঁটতে শুরু করল অমনি ওর হাত পা অবশ হয়ে উঠল। আপটে ওকে সাহায্য করল। ওরা দুজন নৌ বিদ্রোহ করার জন্য বন্দী হয়েছিল। ওদের দুজনের শাস্তির মেয়াদ ছিল সমান এবং ওদের দুজনকে সুরাট জেলে রাখা হয়েছিল। জেলে এসে সুদামার স্বাস্থ্য মোটেই ভালো যাচ্ছিল না। 'এস এস দ্বারভাঙা'য় খালাসির কাজ করতে করতে এবং ইংরেজের চাবুক খেতে খেতে ওর গালের চমক দিনে দিনে কালো গর্তয় রূপান্তরিত হচ্ছিল। তার পরেও কিন্তু ও হাসিখুশি ছিল। কারণ ওর সুষমা ওকে ভালোবাসত। ও দশ ক্লাস পাশ, একদিন না একদিন ও ঠিক উন্নতির আশা রাখত। জাহাজের ছাদে দাঁড়িয়ে জাহাজের গায়ে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে লোনা হাওয়ার ঝাপটা এসে ওর মুখে লাগত, আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠত ওর মুখ। তখন নিজেকে সমুদ্র তথা বিস্তৃত আকাশের মালিক বলে মনে হত ওর। সব সময় ওর মনে, ওর অন্তরের মধ্যে ক্যাপটেনের চাবুকের অনুভব ওকে সজাগ করে তুলত। তবু এর পরেও ও অনুভব করত, যে ইংরেজ জাত সেক্সপীয়ারের জন্ম দিয়েছে কোন একদিন তারা ওর প্রতি অবশ্যই সুবিচার করবে।

কিন্তু যেই জাহাজীদের বিদ্রোহ শুরু হলো অমনি ওর হৃদয়ের গভীরে অতি যত্নে সাজানো প্রাসাদ ভেঙে গেল। অনেক কটা উজ্জল আলো নিভে গেল একসঙ্গে। অন্ধকারে পথ হাতরাতে লাগল ও। পথ খুঁজে বার করতে গিয়ে জানতে পারল, ও কেবল একটা গুণ্ডা। ইংরেজরা ওর হাত থেকে শেক্সপীয়ারকে ছিনিয়ে নিয়ে ওর পিঠে মেরেছে চাবুক। সমুদ্রের সেই সুমধুর বাতাসের স্বাদ এখন আর ওর গায়ে লেগে নেই। প্রথম দিন ও জেলের মধ্যে ডাল খেতে পেল। সে ডালে ডালের পরিমান কম, কাঁকরের পরিমাণ বেশি। সেসব কাঁকর ওর নাড়িভুড়ির

মধ্যে গিয়ে মিশে গেল। ও রুটি খেল, সে রুটির আটা মনে হয় যেন চুন আর কাঁকর দিয়ে তৈরী। এই খাবার খেয়ে, ভারি মোটা শেকল বাঁধা অবস্থায় রোজ সন্ধে পর্যন্ত ওকে খাটতে হতো। শুতে হতো ভিজে মেঝেয়, পাশ থেকে মল মূত্রের গন্ধ আসতো। সূর্য যেমন পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে, এই পরিবেশে সুদামাও তেমনি দিনে দিনে ঢলে পড়ছিল। প্রথমে ওর চোখ ও গালের চমক লুপ্ত হলো, তারপর থেকে শরীর সব সময় অবসন্ন হয়ে থাকত। অল্প অল্প জ্বর হতে লাগল। কাশি হতে শুরু করল। আর কাশি শুরু হতেই ওর জীবনে সন্ধে নেমে এলো। সব সময় ও জ্বরের গন্ধে পশ্চিমের ঠাণ্ডা ও কাঁপুনি অনুভব করতে লাগল।

জেলে আপটে ওর ওপর খুব নজর রাখত। সব সময় সাহস যোগাতো ওকে। আপটেও ছিল সুদামার মতো একজন জাহাজী। কিন্তু ও সুদামার মতো দশ ক্লাস পাশ করেনি। ও জেলে এসেই লেখাপড়া শিখেছে সুদামার কাছে। সুদামা ওকে হতাশার সুরে বলত, "আরে লেখাপড়া করে কি করবে, আমাকে দেখ না দশ ক্লাস পাশ"। আপটে ওকে বাধা দিয়ে বলত, "তুমি পড়াও, শব্দ দিয়ে যা কাজ করার তা আমি ঠিক করে নেব।"

"আরে ভাই এ শব্দ বড় নির্দয়। মানুষকে এমন ঝামেলায় ফেলে যে এর চক্রে পড়ে তার সবকিছু নষ্ট হয়ে যায়। এর চেয়ে অশিক্ষিত থাকা অনেক ভালো।"

আপটে হেসে বলত, "শব্দ নির্দয় নয়, আবার অসহায়ও নয়, এটা কেবল একটা মাধ্যম। নিপীড়িত মানুষ ও তার মতের সমর্থনে এর ব্যবহার করতে পারে।"

কিন্তু সুদামা তার যুক্তি আঁকড়ে পড়ে থাকত। প্রথম প্রথম ও জেলের মধ্যে রাজনৈতিক বিতর্কে খুব আগ্রহ দেখাত। কিন্তু ও কখনো সমাজবাদের সমর্থক হতে পারেনি। যদিও অনেক জাহাজী এদিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল, তবু সুদামার মনের গভীরে দেশভক্তি ও ব্রাহ্মণত্ব মিলেমিশে এমন একটা তৈলাক্ত অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে ওর মনের মধ্যে কোন জল প্রবেশ করতে পারছিলো না। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে ও খুশিতে নাচতে লাগল। সেদিনও ওর জ্বর ছিল এবং বেশ কাশিও হচ্ছিল। আপটে অনেক বোঝানো সত্ত্বেও জেলের ওয়ার্ডার এবং অন্য অফিসারদের সঙ্গে ও স্বাধীনতা উৎসবে অংশ নিল। তারপর দুদিন অচৈতন্য হয়ে রইল। আপটে ওর সেবা যত্ন করল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথম বার চোখ খুলে নিজেকে আবার জেলের মধ্যে দেখতে পেয়ে ও খুব বিস্মিত হল। আপটে ওকে বলেছিল, "না তা কেন। অনেক কয়েদিইতো ছাড়া পেয়েছে, চোর ডাকাত ঘাতক অপরাধী এবং এমন অনেক রাজনৈতিক বন্দী, যারা কেবল অহিংস

আন্দোলন করার অপরাধে বন্দী হয়েছিল।"

বিস্মিত হয়ে সুদামা বলেছিল, "আমারাও তো দেশ স্বাধীন করার জন্য লড়েছিলাম। দেশ স্বাধীন করার জন্যই তো তলোয়ার তুলে ধরেছিলাম।"

আপটে মুচকি হেসে বলেছিল, "তুমি গুণ্ডা।"

তারপর সুদামা চুপ করে যায়। ওর মনে একের পর এক সন্দেহ জাগতে থাকে—আমরা কি ধরনের স্বাধীন হলাম যে এখনো জেলের মধ্যে পড়ে আছি। নানা ফড়নবীস, তাঁতিয়া টোপী যদি গুণ্ডা না হয়, তাহলে আমরা গুণ্ডা হলাম কি করে। জেলের এই সঙ্গী কি সত্যি কথা বলছে·· না···না—আমার নেতা তো মহাত্মা গান্ধী ও ভগবান। তিনি তো একটা মাছি, পিঁপড়ের ওপরও অত্যাচার করার বিরোধী। তাহলে তিনি আমাকে জেলে রাখেন কি করে! নিশ্চয়ই কোথাও কোন একটা ভুল হয়েছে।

ও চিৎকার করে আপটেকে বলল, "নিশ্চয়ই কোথাও কোন ভুল হয়েছে। আমি এখনই দরখাস্ত করছি। তোমাকে, আমাকে, আমাদের সবাইকে ছেড়ে দেবে।"

আপটে বলল, "ঘুমনোর চেষ্টা করো। বেশি চিন্তা করো না।"

চিৎকার করে সুদামা বলল, "তুমি আমাকে কাগজ কলম দাও। আমি তোমাকে বলছি, তোমাকে, আমাকে, সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আমি, তুমি···সবাই। আমাদের সমস্ত সঙ্গী···"

"ছেড়ে দেওয়া হবে", আপটে বলল, "আমাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে। হ্যাঁ তবে পুরো শাস্তি ভোগ করার পর যথা সময়ে, তার আগে নয়।"

ওদের দুজনকে আজ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জেল কর্তৃপক্ষ ওদের নির্ধারিত সময়ের তিন দিন আগে ছেড়ে দিয়েছে। তাই ওরা ওদের আত্মীয়স্বজনদেরও জানাতে পারেনি। আর আপটের বাড়ি তো সুরাটেই। ও ওর বউ বাচ্চাকে অবশ্য খবর দিতে পারত, কিন্তু···"ঠিক আছে চলো তো" ··আপটে বলল, "আমি আচমকা বাড়ি গিয়ে উঠলে যমুনা আমাকে দেখে খুব খুশি হবে আর আমার ছোট্ট নারায়ণ আপটে···" আপটে বার বার এই নামটা মনে মনে এমন ভাবে আওড়াতে লাগল যেন ও নিজেই শেক্সপীয়রের কোন বইয়ের লেখক।

সুদামা সোজা সুরাট স্টেশনে যেতে চাইছিল। তাহলে ওখান থেকে বোম্বাইয়ের গাড়ি ধরতে পারবে। কিন্তু আপটে ওকে জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করল, "তোমাকে আগে আমার বাড়ি যেতে হবে। অন্য গাড়িতে বোম্বাই যাবে অখন।" সুদামা

আপত্তি করতে পারল না। যদিও সুদামা সোজা স্টেশনে চলে যেতে চাইছিল। দুই বন্ধুতে মিলে ভীমরাও গলিতে ঢুকল। এখানেই আপটের বাড়ি।
সুদামা আর আপটে যখন চুপচাপ গলি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, তখন গলিতে বিশেষ ভিড় ছিল না। দুটি মহিলা আনাজের ব্যাগ নিয়ে যেতে যেতে আপটেকে দেখে থেমে গিয়ে ঘুরে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আপটে সামনের দিকে দেখছিল। সামনে বাড়ির উঠোনে দুটো মেয়ে দড়ি দিয়ে লাফাচ্ছিল। আপটেকে দেখে একটি মেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আপটে চুপচাপ ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। ঘরের দরজায় ও নারায়ণ আপটেকে দেখতে পেল। পরনে পোশাক নেই, একেবারে ন্যাংটো। কোমরে একটা কালো কার বাঁধা। আমের আঁটি চুষছে। হাত বাড়িয়ে আপটে নারায়ণকে কোলে তুলে নিল। এবার ও বউকে দেখতে পেল। বউ তখন গরম জলে চায়ের পাতা ফেলছিল। আপটে ডাকল—"যমুনা।"
যমুনার হাত থেমে গেল। ওর কাঁপতে থাকা হাতের আঙুল থেকে চা-পাতা পড়ে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে ও উঠে দাঁড়াল। সুদামা এবং আপটের দিকে পেছন ফিরে উঠে দাঁড়াল। সারা শরীর কাঁপছে ওর।
আপটে বলল, "যমুনা আমি এসেছি। আর এই দেখ আমার বন্ধু সুদামা।"
যমুনা মুখ ঘুরিয়ে ছল ছল চোখে সুদামার দিকে তাকিয়ে দেখল। আপটের কোল থেকে নারায়ণকে নিজের কোলে ছিনিয়ে নিল। বার বার ওর মুখে চুমু খেতে লাগল। আপটে যমুনার কাঁধে হাত রাখল। তখন সুদামার মনে হলো, রেলপথের অনেক দূরে একেবারে শেষ প্রান্তে ওর জন্য সুষমা অপেক্ষা করে আছে, আর ও কি না এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছে। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পরে আপটে বুঝতে পারল সুদামা ঘরে নেই।
সুদামা সুরাট স্টেশনে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল। ওর পকেটে কেবল বোম্বাই পর্যন্ত টিকিট, আর একটাও পয়সা নেই। বোম্বাই গিয়ে ও কি করবে, এখন ওর সে চিন্তা নেই। বোম্বাইয়ে ওর সুষমা আছে। তাকে ও তিন বছর দেখেনি। জেলে বন্দী হবার পর সুষমা কয়েকবার ওকে দেখতে এসেছিল। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, সেজন্য ওর আর্থিক অবস্থা নিয়ে ও বিশেষ চিন্তিত ছিল না। সুষমা সাদা শাড়ি পরে প্রথম সাক্ষাতের দিন জেলের গরাদের সামনে এসে যখন দাঁড়াল, তখন বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। মনে হচ্ছিল যেন আকাশে ভেসে বেড়ানো পরী নেমে এসেছে মাটিতে। যেন শেক্সপীয়ারের 'মিড সামার নাইট'-এর স্বপ্ন। জেলের মধ্যে সুদামা কয়েকবার এই স্বপ্ন দেখেছে। সে স্বপ্নে সুষমা ছিল। এক বছর পরে সুষমার মা বাবা যখন সুদামাদের আর সাহায্য করতে রাজি হলো না, তার

পরও সুদামা এই স্বপ্ন দেখেছে। দেখেছিল, কারণ সুষমা ওকে আশ্বাস দিয়েছিল, সে তো একা, কোন একটা কাজ কর্ম করে নিজের পেটটা ঠিক চালিয়ে নেবে। আর ওর আসার অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকবে। জেল জীবনের শেষ তিনটে বছর ও নিশ্চয় এতোই কষ্টে দিন কাটিয়েছে, যে সুরাটে আসার রেল ভাড়াটুকুও জোটাতে পারেনি। এই তিন বছর সুষমা ওকে চিঠি লিখেছে। প্রতিটা চিঠিতে সুষমা ওকে ধৈর্য ধরে, ঠাণ্ডা মনে এই দুঃখ সইতে বলেছে। জেলের দীর্ঘ, একান্ত সময়ে চিঠিগুলো খুলে খুলে ও পড়ত। আজও গাড়িতে বসে চিঠিগুলো পড়তে লাগল। এগুলোর মধ্যে কয়েকটা চিঠি খুব পুরনো, পেন্সিলে লেখা। যদিও আজ এসব পেন্সিলের লেখা মুছে গেছে, তবু সুদামার কাছে ওগুলো আজও প্রেমের চিহ্নের সমান। ওর মনে হয় ওগুলো যেন সূর্যের আলো দিয়ে লেখা। সুদামার উদ্দেশ্যে লেখা এক একটা শব্দে সুষমার মুখ ভেসে ওঠে। এইসব শব্দের মাধ্যমে ও কখনো হাসে, কখনো, আঁচলে মুখ লুকিয়ে নেয়, কখনো আড় চোখে দেখে কখনো লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলে। সুদামা জানলার পাশে বসে তার পরিশ্রমের ছাপ লাগা, চোখের জলে ভেজা, ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া পাঁজরার মতো ফ্যাড়ফ্যেড়ে কাগজে লেখা সুষমার এক একটা চিঠি বের করে পড়তে থাকে। থেকে থেকে সুদামার ভয় হয়, সুষমা কি ওকে এখন চিনতে পারবে। সে তো আজ থেকে সাড়ে চার বছর আগেকার সুদামা আর নেই। আজ ও নিজেই নিজেকে চিনতে পারে না। এই ভেতরে ঢুকে যাওয়া চোখ, ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসা···ক্লান্তিহীন মুখ··· ধুঁকতে থাকা শরীর···। সুদামা মুখ ফিরিয়ে গাড়িতে বসে থাকা অন্য যাত্রীদের দেখে। এরা কেউ জানে না আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে লড়াই করেছিলাম।

সুদামা জোরে জোরে কাশতে থাকে। মুখে কফ উঠে আসে। ওকে এভাবে কাশতে দেখে খদ্দরের পোশাক পরা এক যাত্রী বললেন, "এমন রোগ নিয়ে ট্রেনে ওঠার কি দরকার ছিল। অন্য যাত্রীদের ঝামেলায় ফেলে গাড়ির মধ্যে মরাটাই দেখছি বড্ড জরুরি হয়ে পড়েছে আপনার।"

চুপ করে থাকে সুদামা। খদ্দর পরা বাবু ওকে শুনিয়ে আবার বললেন, "একটু সরে বসো। সবার মধ্যে আর তোমার রোগ ছড়িও না।"

সুদামা আগের মতোই চুপ করে রইল। ওর মনের মধ্যে একটা শব্দ বার বার ভেসে উঠতে লাগল···গুণ্ডা···গুণ্ডা···গুণ্ডা···গুণ্ডা···তারপর ও নিজেই শব্দটাকে পিসে ফেলল। এখন কেবলই ওর সুষমার মুখ মনে পড়ছে। গাড়িতে বসে থাকা অন্য যাত্রীদের ও একেবারে ভুলেই গেল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

যদিও জানত ওর ছাড়া পাবার খবর সুষমা পায়নি, তবুও বোম্বাই স্টেশনে সুষমাকে খুঁজতে লাগল ও। সুষমা যদি নাই জেনে থাকবে তাহলে সে আসবে কি করে? তবুও বেশ কিছুক্ষণ সুষমাকে স্টেশনে দেখতে পাবার তীব্র ইচ্ছা অনুভব করতে লাগল ও এবং ওকে দেখতে না পেরে অনেকক্ষণ হতাশায় মন ভারি করে রইল। তারপর নিজের মনে হেসে বলল, "আমি বড্ড বোকা, এখন আমাকে বিনা টিকিটে গাড়িতে চাপতে হবে।" নিজের এই সিদ্ধান্ত মতো ও তাড়াতাড়ি বান্দ্রা যাবার একটা লোকাল ট্রেনে উঠে পড়ল। রাস্তায় বা স্টেশনে কেউ টিকিট চাইল না। নিশ্চিন্তে স্টেশন থেকে নেমে পেছনের শেডের মধ্যে দিয়ে ছোট ছোট বাড়িগুলোর দিকে এগিয়ে গেল ও। আজ থেকে সাড়ে চার বছর আগে ও এখানে সুষমার সঙ্গে থাকতো।

কিন্তু আজ আর সেখানে টালির ছাদের কোন বাড়ি নেই। সেখানে একটা বিরাট ছ'তলা বাড়ি তৈরি হয়েছে আর তার আশেপাশে কয়েকটা রং চঙে ছোট খাট বাড়ি। এক একটার গায়ে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা 'গঙ্গা নিবাস' 'যমুনা কটেজ', 'মহতা লজ্', 'আশা ধাম'। এই সমস্ত বাড়ির পাশ দিয়ে বড় বড় রাস্তা চলে গেছে। প্রখ্যাত ভারতীয় নেতাদের নামে রাস্তার নাম লেখা— নেহরু রোড, প্যাটেল এভিনিউ, সুভাষ স্ট্রীট। এই সমস্ত রাস্তায় সুন্দর সুন্দর হাসি খুশি শিশুরা আনন্দে খেলছে, কোলাহল করছে।

এ দৃশ্য দেখে সুদামা বড্ড আঘাত পেল মনে। ঘাবড়ে গিয়ে পথ চলতি এক মানুষকে বলল, "আচ্ছা সুষমা কোথায়?"

"কে?" লোকটা বলল।

আগের মতোই বিস্ময়ের ঘোরে সুদামা বলল, "কিছু না, ভুল হয়ে গেছে।"

"পাগল নাকি!" ঐ লোকটা রাগে কটু মন্তব্য করে এগিয়ে গেল।

ছ'মাস আগে লেখা সুষমার শেষ চিঠি বার করল সুদামা। হ্যাঁ, এই ঠিকানাটাই তো রয়েছে। তাহলে ও এখন কোথায় চলে গেল। কি ঝামেলায় পড়া গেল। হতাশ হয়ে পড়ল সুদামা। এমন সময় দামী শাড়ি পরে, সুগন্ধি তেল দিয়ে চুল বেঁধে এক মহিলা গাড়িতে বাচ্চাকে বসিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ওর সামনে দিয়ে নিয়ে গেল। ধক ধক করে উঠল সুদামার বুক। মুখের ওপর আনন্দের তীব্র ঢেউ খেলে গেল। পর মুহূর্তেই ওর সারা শরীর কাঁপতে লাগল। সুষমা···হ্যাঁ সুষমাই তো ও···কিছুক্ষণ ও জড়বৎ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ও সুষমার পেছন পেছন দৌড়তে লাগল। এদিকে সুষমা ততক্ষণে উঁচু বাড়িটার সামনে পৌঁছে গেছে। সুদামা হাঁপাতে হাঁপাতে ওর কাছে গিয়ে হাসি মুখে ওর সামনে

দাঁড়াল। সুষমা ওকে বলল, "আচ্ছা তোমাকে কি শেঠ প্রদ্যুম্নলালজী পাঠিয়েছেন? ওপরে এসো। বাচ্চার গাড়িটা লিফট পর্যন্ত নিয়ে এসো তো।" এ কথা বলে সামনে এগিয়ে গেল সুষমা। ওর পেছন পেছন বাচ্চার গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে সুদামা লিফট পর্যন্ত এলো। গাড়িতে একটা সুন্দর বাচ্চা নিপিল চুষছিল। সুষমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সুদামা। কিন্তু সুষমা ওর দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। লিফটের কাঁচে নিজের চুল ঠিক করতে লাগল। সুদামা আবার মুচকি হাসল—'আমায় চিনতে পারল না, আমিও ঠিক এমনটাই ভেবেছিলাম। বেশ মজা হবে। সুষমার শরীর এখন কেমন ফর্সা হয়ে গেছে। ফর্সা গোল গলায় হারটাও বেশ সুন্দর মানিয়েছে। আমার কাজ নিয়ে ও ভালোই করেছে, না হলে মরত না খেয়ে। কিন্তু, আচ্ছা থাক, সে পরে হবে। ও সব আমি ঠিক করে নেব।' সুদামার মনের মধ্যে হাজারটা কথা পাক খেতে লাগল। ওর রুগ্ন ময়লা মুখের ওপর আশার উজ্জ্বল আলো চমকে উঠল। পাঁচতলায় এসে লিফট থামল। বাচ্চার গাড়িটা নিয়ে সুষমা ভেতরে চলে গেল। ড্রইং-রুমে সুদামা একা বসে রইল। ভেতর থেকে শিশুর হাসির আওয়াজ ভেসে এলো। পুরুষের কণ্ঠ শোনা গেল, তারপর নারীর কণ্ঠ। কেউ একজন কাউকে চুমু খেল। সুষমা বাইরে এসে বলল, "তোমাকে আমাদের প্রয়োজন নেই। শেঠ প্রদ্যুম্নলালজীকে বলে দিও, শেঠ কিষনলালজী বলছেন, আমাদের একজন বেশ শক্ত সমর্থ চাকর চাই। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ।"

সুদামা এক পা সামনে এগিয়ে এসে ডাকল, "সুষমা"।

সুষমার মুখ হাঁ হয়ে গেল। বড় বড় চোখ মেলে গভীর বিস্ময়ে ও সুদামাকে দেখতে লাগল। তারপর ওর মুখ থেকে চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি পেছনে হটে একটা তেপায়া টেবিলে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল ও। টেবিলের ওপর রাখা চমৎকার কাঁচের ফুলদানি মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ফুলদানি পড়ার আওয়াজ শুনে ভেতরের ঘর থেকে ভারি শরীরের একজন লোক বেরিয়ে এলো। লোকটার হাসিখুশি প্রসন্নমুখ। টকটকে গায়ের রং। রক্তবাহী শিরাগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। লোকটা বাদামী রং-এর সিল্কের পাঞ্জাবি এবং সাদা ধুতি পরেছে। পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম।

"কি হয়েছে সুষমা?" বেরিয়ে এসে লোকটা বলল।

চোখ মেলে অত্যন্ত ধীর স্বরে সুষমা বলল, "এই হল সুদামা।"

ধক ধক করতে লাগল সুদামার বুক, ওর শরীরের রক্ত জলে আগুনের লাভা হয়ে গেল। বুদবুদের মতো ফুটে উঠতে লাগল। নিজেকে শুনিয়ে ও বলে উঠল, "না,

না, নিশ্চয়ই কোথাও কোন ভুল হয়েছে। কোন ভুল বোঝাবুঝির—
"বসো, বসো সুদামা!" শেঠ কিষনলাল অত্যন্ত নরম সুরে হেসে বললেন, "এই চেয়ারটায় বসে শোন। তোমার বউ খেতে পেতো না। প্রথম দিকে অবশ্য আমি জানতাম না ও তোমার বউ। আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি।"
"শপথ করার কোন দরকার নেই," সুদামা বলল।
শেঠ কিষনলাল বললেন, "আর এখন? এখন"—একটুক্ষণ থেমে হাত কচলাতে কচলাতে কিষনলাল বললেন, "এখন অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে ও আমার ঘরের আপন লোক হয়ে গেছে। আমি এই বাড়িটা ওর নামে লিখে দিয়েছি। এই পুরো বাড়িটার নাম দিয়েছি সুষমা; তুমি দেখেছ নিশ্চয়ই?"
"আর এই বাচ্চাটা।" সুদামা বলে ফেলল।
"হ্যাঁ, এই বাচ্চাটা আমার মানে তোমারই। কেননা আইনত আমি এখনও সুষমাকে বিয়ে করিনি। তাই—"
"তাই এই বাচ্চাটাও আমার।" চিৎকার করে উঠল সুদামা।
শেঠ কিষনলাল বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। আরে তুমি এত জোরে চিৎকার করছ কেন। আরাম করে চেয়ারে বসে কথা বলো। আমরা তুলোর ব্যবসায়ী। কত বড় বড় সমস্যা আমরা একসঙ্গে বসে ধীরে ধীরে কথা বলে শান্তিতে মিটিয়ে ফেলি।"
"আমার বউও কি তুলোর গাঁট?"
"কি সব কথা বলছ? একটু ভেবে দেখ সুদামা, তুমি নিজেই এতো অসুস্থ। তোমার এখন বিশ্রামের দরকার। আমি তোমাকে কোন পাহাড়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওখানে গেলে তোমার শরীর সুস্থ হয়ে যাবে। যতো টাকার দরকার আমার কাছ থেকে নিয়ে যাও। আমি জানি জেলের খাওয়া কতো খারাপ। নমক সত্যাগ্রহের সময় জেলে গিয়ে আমি জেনেছি কতোটা কষ্ট হয়। কোথায় বাড়ির সুখ আর কোথায় ঐ কষ্ট। আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছি।"
শেঠ কিষনলাল চেকবুক বার করে সুদামার সামনে খুলে ধরে বললেন, "বলো, বলো—কতো টাকার চেক লিখে দেব।"
সুদামা এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে দরজার দিকে ফিরে যেতে লাগল। সুষমা ওর দিকে এগিয়ে গেল। কাছে এসে হাত জোড় করে বলল, "আমায় ক্ষমা করো। খাওয়া জুটতো না, আমার একদম খাওয়া জুটত না।"
সুষমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখল সুদামা। কাঁপতে থাকা ঠোঁট দিয়ে কেবল এটুকুই বলতে পারল, "খেতে পেতে না তো নিজের হাত পা দিয়ে শ্রম তো

বেচতে পারতে। আমার ইজ্জত বিক্রি করতে গেলে কেন ?"

শেঠ কিষনলাল সুদামার দিকে তাকিয়ে টেলিফোন তুললেন।

সুদামা বাইরে চলে যেতেই সজোরে বন্ধ করে দিলেন দরজার পাল্লা।

সুদামার মনে নেই ও কখন লিফট দিয়ে নামল, কখনইবা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বান্দ্রা পুলে এসে গেল। এটুকুই কেবল অনুভব করতে পারল মুহূর্তকাল পূর্বে ও সুষমার কাছে ছিল আর এখন বান্দ্রা পুলের সামনের বিশাল সমুদ্র দেখছে। অস্ত গেছে সূর্য। ক্যালটেক্স রিফাইনারীতে নানা রং-এর আলো জ্বলছে। মসজিদে নামাজীরা নামাজ করতে যাচ্ছে। পাঁঠা কাটা হচ্ছে পাশের কসাইখানায়। সমুদ্রের মধ্যে রক্ত মল মিশে যাচ্ছে। শরৎকালে ঝরে যাওয়া গাছের শুকনো পাতা সমুদ্রের জলে যেয়ে পড়ছে। নৌকাগুলো মাস্তুল খাড়া করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সুদামা পুলের ওপর পা ঝুলিয়ে বালি ও জলের লড়াই দেখছে। এই বালিতেই সুদামা রূপোর মহল তৈরী করেছিল।

'মিড সামার নাইট'-এর নীল ছায়ায় সুন্দর সজল সুষমাকে খুব সেজেগুজে যেতে দেখল। তারপর হঠাৎ দুপুর হলো। বালির মহল ভেঙে গেল। সে দৃশ্য মুছে গেল। হৃদয় তোলপাড় করা দিনের আলোর রানীকে রাতের নির্দয় রানীর হাতে তুলে দেওয়া হলো। ধরা ধরা গলায় সুদামা বলল—"সুষমা—সুষমা!" ওর চোখ জ্বলছিল, কিন্তু জল ছিল না চোখে। এমন সময় একটা লোক ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, "সুদামা—সুদামা তোমার নাম।"

সুদামা মুখ ঘুরিয়ে দেখল লোকটা পুলিশ।

মাথা নাড়িয়ে সুদামা বলল, "হ্যাঁ।"

পুলিশটা বলল, "তোমার নামে ওয়ারেন্ট আছে, জন নিরাপত্তা আইনে তোমাকে গ্রেফতারের আদেশ আছে।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য সুদামা চুপ করে রইল। তারপর ওর মুখের ওপর এক অদ্ভুত হাসি ভেসে উঠল। অত্যন্ত শান্ত স্বরে বলল, "একটুখানি দাঁড়াও আমি যাচ্ছি।" সুদামা পকেট থেকে সুষমার চিঠিগুলো বার করল। চিঠির যাবতীয় শব্দ চির-কালের জন্য হারিয়ে গেছে। এই পুরনো গলা পচা কাগজের টুকরোর মধ্যে থেকে চিরকাল ও নতুন অর্থ খুঁজেছে। গলা পচা কাগজগুলোকে কুটি কুচি করে সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসিয়ে দিল ও।

এবার যখন ও পুলিশটার সঙ্গে বান্দ্রা পুল থেকে উঠল, তখন কিন্তু ওর মনে কোন ভুল, বা কোন ভুল বোঝার দোষের আশঙ্কা নেই।

নিঃসঙ্কোচে শান্তমনে ওর সঙ্গে যেতে লাগল সে।

একই প্রত্যাশা

লতা খরমারকর-এর বয়স যখন ছ বছর, তখন ওর মা বাবা ওকে বোম্বাইয়ের এক গুণ্ডা দত্তা ফাড়কর-এর কাছে দেড়শো টাকায় বিক্রি করে দেয়। মেয়েকে দেখতে সুন্দর তাই ওরা দেড়শো টাকা পেল, নইলে ঐ দুর্ভিক্ষের সময়ে এই বয়সের মেয়ের জন্য পঁচাত্তর টাকাও পেত না। মেয়েটাকে দেখতে সুন্দর, তাই দত্তা ফাড়কর ভেবে রেখেছিল চার পাঁচ বছর বাদে ও নিজেই মেয়েটাকে বিয়ে করে নেবে। কিন্তু ঠিক দু বছর পরে একটি অপরাধকাণ্ডের জন্য দত্তা ফাড়কর-এর সাতশো টাকার প্রয়োজন হলো। পুলিশ ওকে বোম্বাই থেকে মেরে তাড়াবার জন্য একেবারে উঠে পড়ে লেগেছিল। লতাকে বিক্রি করার ইচ্ছে দত্তার মোটেই ছিল না। কিন্তু কি উপায়। বোম্বাইয়ে থাকতে গেলে যেভাবেই হোক সাতশো টাকা যোগাড় করতেই হবে। বোম্বাইয়ে থাকতে পারলে কারবার ভালোই চলে, আর যতোদিন কারবার ভালো চলে ততোদিন ভালো ভালো মেয়েও জুটে যায়, এসব ভেবেই দত্তা ফাড়কর লতা কে সাড়ে চারশো টাকায় এক গোয়ালার কাছে বিক্রি করে দিল। পঞ্চাশ টাকায় একটা কাঠের খাট বিক্রি করল। এক অর্থবান খোজার শত্রুকে রাতারাতি খুন করে ফেল্‌ল। খুন করে মাত্র একশো টাকা পেল। যদিও দেড়শো টাকার কমে ও এ কাজ করে না। বলার তাৎপর্য এটাই কোন-না-কোন ভাবে সাতশো টাকা ও আগে থাকতে যোগাড় করে ওর বোম্বাই থেকে বিতাড়িত হবার সম্ভাবনাকে রোধ করার চেষ্টায় ছিল।

দুধওয়ালা দাদাটি লতাকে গিরগাঁও থেকে গোরেগাঁও-তে নিয়ে গেল, ও মেরঠের লোক, লোকটার নাম বংশীলাল। এখানেই ওর খাটাল। এই খাটালের বাইরেও নিজের জন্য একটা টালির ঘর করে নিয়েছে। এখানে ও নিজে থাকে এবং এখন ওর সঙ্গে লতাও থাকতে লাগল।

অতি সাধারণ একটা ঘরে থাকলেও দুধ বিক্রি করে ওর ভালোই আয় হতো। যেদিন জল বেশি চালত সেদিন বেশি লাভ হতো। যেদিন জল কম চালত সেদিন লাভ কম হতো। জল কম বেশি চালাটা ওর মুডের ওপর নির্ভর করত, কারণ বংশীলালের জুয়া খেলার অভ্যাস ছিল, যেদিন ও জুয়ায় বেশি হারত, ঠিক তার পরের দিন ও দুধে বেশি জল চালত। যেদিন জিতত তার পরের দিন খদ্দেররা একটু ভালো দুধ পেত, দুধে জল দিয়ে বিক্রি করা ছাড়াও বংশীলাল জলে কোকেন মিশিয়ে বিক্রি করত। অন্ধেরী এবং শিবাজী পার্কে ওর পানের দোকান ছিল এবং এই দুটো দোকান থেকে ওর দিনে দশ টাকা আমদানি হতো। বংশীলাল স্বচ্ছল আর্থিক অবস্থায় ভালো রকম খাওয়া দাওয়া করে দিন কাটাত। ও খেতো কম, পান করত বেশি। ও গেলাসে চুমুক মেরে থেকে

থেকে লতাকে দেখত। গোঁফে তা দিতে দিতে লতাকে বলত—"তিন বছর অপেক্ষা করো—আর মাত্র তিন বছর অপেক্ষা করো—তারপর আমি তোমাকে বিয়ে করে নেব।"

এ কথা শুনে লতা হাসত।

ও হিন্দুস্তানী ভাষা বুঝতে পারত না। তবে কাড়কর-এর কাছ থেকে বংশীলালের কাছে এসে ওকে হিন্দুস্তানী ভাষা শিখতে হলো। তা ওর পক্ষে ভালোই হলো। বংশীলাল নিজে সামান্য হিন্দী জানত। যেটুকু জানত, সেটুকু ও লতাকে শিখিয়ে দিল। লতা তাড়াতাড়ি যুবতী হয়ে উঠুক এটাই বংশীলাল অন্তর দিয়ে চাইত। ও শুনেছে বিদেশে নাকি এমন একটা মেশিন আবিষ্কার হয়েছে যাতে মুরগির ডিম রাখে একুশ দিন আর বাচ্চা হওয়ার জন্ত বসে থাকতে হয় না। মেশিনের এদিক দিয়ে ডিম দাও, ওদিক দিয়ে বাচ্চা বার করে নাও। দু ঘণ্টার মধ্যে সব কাজ শেষ। বংশীলাল ভাবে এমন কোন মেশিন যদি পাওয়া যেত, যাতে সাত আট বছর বয়সের মেয়েকে এদিক দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে ওদিক থেকে ষোল বছরের যুবতীকে বের করে নেওয়া যায়। হা ভগবান! তাহলে তো কতো বছর সময় বেঁচে যেতো।

কিন্তু ভগবানের ইচ্ছে নয় লতা বেশি দিন বংশীলালের কাছে থাকে। পনেরো মাসটাক লতা বংশীলালের কাছে ছিল। তারপর একদিন রাতে বংশীলাল নেশার ঝোঁকে ওকে জুয়ার বোর্ডে হারিয়ে ফেলল। লতা মজুর কাদির কাবাড়িয়ে-র হেফাজতে চলে গেল। ও দাদরে পুরনো ফার্নিচার নিলাম করে। মজুর লতার নাম রাখল সাকিনা। দু বছর ধরে ও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম করে পয়সা জমাতে লাগল। কারণ ও সাকিনাকে বিয়ে করতে চায়। ও নিজে আবার একজন ভালো বাবুর্চি। তাড়াতাড়ি যাতে বিয়েটা হয়ে যায় সে জন্ত ও সাকিনাকে বাইকুল্লার এক সেলাই স্কুলে ভর্তি করে দিল এবং নিজে নিলাম ঘরে অত্যন্ত পরিশ্রম করে পয়সা বাঁচাতে লাগল। ও যাই করুক, ওর ভাগ্যে হয়তো অন্ত কিছু লেখা ছিল। ওর বিয়ের কয়েক মাস আগেই শহরে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল এবং সে সময় একদিন সাকিনা বাইকুল্লার সেলাই স্কুলে গিয়ে আর ফিরে এলো না। পথে বাইকুল্লার এক গুণ্ডা গোমেজ ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধ ইহুদি দায়ুদের হাতে তুলে দিল। দায়ুদ অত্যন্ত চতুর কঞ্জুস মানুষ। অনেক দিন ধরেই ও লতাকে বাইকুল্লা দিয়ে যেতে আসতে দেখে। ও অনুমান করেছিল মেয়েটা বড় হলে দেখতে খুব সুন্দর হবে। আস্তে আস্তে ও লতা ওরফে সাকিনার নাড়ি-নক্ষত্র জেনে নিল এবং ওকে তুলে নেবার সুযোগের অপেক্ষা

করতে লাগল। দায়ুদের এটাই পেশা। ও সব সময় দু একটা মেয়েছেলে পোষে এবং তাদের রোজগারে খায়। এটা হারামের রোজগার নয়, হকের রোজগার। ও ওদের থাকার জায়গা দিত, ওদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করত, ওদের জামা-কাপড় সেলাই করে দিত, ওদের নাচ গান শেখাত তারপর বোম্বাইয়ের কোন সেরা হোটেলে কোন ক্যাবারেতে চাকরি দিয়ে দিত। মেয়েগুলোকে সারা মাস কিছু পয়সা দিয়ে বাকিটা নিজে নিয়ে নিত। মেয়েগুলো বড় হয়ে দু চার বছর ওর হাতে থাকত, তারপর ওর কাছ থেকে চলে যেতো। এও একদিন ওর কাছ থেকে চলে যাবে, কিন্তু যাবার আগে পর্যন্ত তো মুর্গি সোনার ডিম দেবে। লতার সৌন্দর্য দেখে বুড়ো দায়ুদ অনুমান করে নিল, এই মুর্গিটা ওর ব্যাঙ্কে কতো গুলো সোনার ডিম জমা করবে। তাই ওকে অত্যন্ত আদর ও যত্নের সঙ্গে নিজের কাছে রাখল। বাড়ির চাকরানী মেয়েটা, যার নাম র‍্যাচেল, ওকে ইংরেজি শেখায়। বুড়ো দাউদ নিজে ওকে নাচ শেখায়। আর ওর পঞ্চান্ন বছরের পুরনো বন্ধু পিটার, ওকে গান শেখায়। পিটার বান্দ্রা খ্রীশ্চান ক্লাবের বিখ্যাত গায়ক। দায়ুদ লতার চুল ছেঁটে ছোট করে দিল। দায়ুদ ওর পায়ে দিল হিল তোলা জুতো, মুখে দিল ইংরেজি ভাষা আর হাতে দিল গিটার। লতা ওরফে সাকিনা, এখন লানা ও ব্রেয়ন হয়ে গেল। এমন পরিবর্তনে অসুবিধে হলো না, কারণ ওর গায়ের রঙ অত্যন্ত ফর্সা, মাথার চুল সোনালী আর চোখে বিদ্যুতের ঝলক—দেখে মনে হয় যেন ও এদেশের নয়, কোন পরীর দেশ থেকে এসেছে।

দায়ুদের বাড়িতে লতা সব সুখই পেয়েছিল। একটাই কেবল ওর দুঃখ ছিল—বুড়ো দায়ুদ ছিল অত্যন্ত কৃপণ। ও প্রতিটা পয়সা দাঁত দিয়ে চেপে ধরত। দায়ুদ আজ পর্যন্ত বিয়ে করেনি। ওর কোন নিকট আত্মীয় জীবিত নেই। তবু কে জানে কেন পয়সার প্রতি ওর এতো মোহ। মেয়েটাকে ভালো মতো ফাঁসাবে বলে দাউদ ওকে নিজের পাশ বই দেখাত। ওর পাশ বইয়ে ষাট হাজারেরও বেশি টাকা জমা রয়েছে। ওর ওপর ও এতোই দয়ালু হয়ে উঠল যে শেষ পর্যন্ত লানা ও ব্রেয়নকে বিয়ে করার কথা দিয়ে বসল। আজ পর্যন্ত ও কারুকে বিয়ে করার কথা দেয়নি। লতার মনে পড়ে তেরো বছর বয়সে ও যখন প্রথম ওয়েস্ট এণ্ড হোটেলের ক্যাবারেতে যোগ দিল এবং পঞ্চাশ টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে বাড়ি এলো, তখন রাস্তায় ওর ক্যাডবেরির মিল্ক চকলেট খাবার ইচ্ছে হলো। বুড়ো দাউদ ওকে পকেট খরচের জন্য কেবল দু আনা করে দিত। এই পয়সা ও প্রতিদিন নিজের কাছে রেখে দিত। এক হপ্তা হয়ে গেলে ক্যাডবেরির চকলেট কিনে খেতো। কিন্তু আজ তো ওর কাছে পঞ্চাশ টাকা রয়েছে। ওর নিজের রোজ-

গায়ের পঞ্চাশ টাকা। চোদ্দ আনা পয়সা খরচ করে ও নিশ্চিন্তে একটা চকলেট কিনে বেড়ালের মতো কুটকুট করে খেতে লাগল। বাড়ি ফিরে বাকি টাকাটা খুশী মনে বুড়ো দাউদের হাতে তুলে দিল। অ্যাডভান্সের টাকা কটা গুনে দাউদ ওকে জিজ্ঞেস করল, "চোদ্দ আনা কোথায় গেল?"

"চকলেট খেয়েছি", লানা উত্তর দিল।

বুড়ো চামড়ার হাণ্টার বার করল।

লানার হাণ্টার পেটা খাবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। যখনই নাচ বা গানের তালে অথবা ঘরের কাজে কোন ভুল করত, যেগুলো সত্যিই ভুল, হাসি মুখে সে তখন হাণ্টার পেটা সহ্য করত। কিন্তু আজ ওর আত্মা বিদ্রোহ করে উঠল। পেছনে সরে যেতে লাগল ও। বুড়ো সামনে এগিয়ে আসতেই দুহাত তুলে মুখ আড়াল করল। কিন্তু বুড়ো ওকে মাটিতে ফেলে পিঠে হাণ্টারের বাড়ি মারতে লাগল। তীব্র যন্ত্রনায় চিৎকার করতে লাগল লানা। কিন্তু এ ওর পুরনো অভ্যাস। ওর কান্নায় বুড়ো দাউদ বিশেষ বিচলিত হলো না। যতোক্ষণ না নিজের রাগ পড়ল, ততোক্ষণ ওকে মনের সুখে হাণ্টার পেটা করে গেল।

সেদিন রাতে লানা ও ব্রেয়ন বুড়োর ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

জীবনে এই প্রথমবার ও নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করল। এতোদিন ও সব সময় অন্যের ভরসায় থেকেছে, অপরের আশ্রয়ে থেকেছে, অন্যের হাতে জুতো খেয়েছে, এর হাত থেকে তার হাতে কেনা বেচা হয়ে ফিরেছে। জীবনের অন্য কোন রকমের ছবি ওর মাথায় স্থান পায়নি। তাই বাড়ি থেকে পালিয়ে বেশ চিন্তায় পড়ে গেল ও। চার্চগেট স্টেশনে বসে ভাবতে লাগল কোথায় যাওয়া যায়? বুড়ো পিটারের কাছে? সে তো আবার ওকে দাউদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। নাকি ওর চাকরানি র‍্যাচেলের বাড়িতে? সেও তো আবার ওকে বুড়োর বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। তাহলে, এখন কোথায় যাবে ও?

শৈশবকাল থেকে এপর্যন্ত সারা জীবনের কথা মনে পড়ে গেল ওর। মনে পড়ল কোলাপুর থেকে বাইকুল্লা আসার সেই সন্ধ্যার কথা, যেদিন দত্তা ফাড়কর ওকে কোলাপুর থেকে আনতে গিয়েছিল। খুব খিদে পেয়েছিল ওর। মা দত্তা ফাড়করের দেওয়া টাকায় ডাল ভাত রেঁধেছিল সেদিন। তখন দত্তা ফাড়কর-এর ট্রেন ধরার তাড়া। দাম নিয়ে মা মেয়ে আবার না বেঁকে বসে সেই ভয়ে ও তাড়া লাগাচ্ছিল। খিদেয় কাঁদছিল ও। তবু দত্তা ফাড়কর ওকে বাড়ি থেকে জোর করে স্টেশনে তুলে নিয়ে এলো। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় লতার ক্রন্দনরত

চোখমুখের ওপর ঢাকা দেওয়া ছিল। উনুনে ডাল সেদ্ধ হচ্ছিল তখন। মা মাথা নিচু করে উনুন থেকে ছাই পরিষ্কার করছিল। তামাক খাচ্ছিল ওর বাবা। মুক্তো কাড়কর যে বাড়িতে থাকত সেটা আবার অন্য এক ধরনের বাড়ি। কতো রকমের বাড়ি যে হয়! বাড়ি কি? বিয়ে কাকে বলে? সুখ কি জিনিস। মানুষ তার ইচ্ছানুযায়ী কি ভাবে থাকে? এই যে মহিলারা বাচ্চার হাত ধরে মাথায় বিবাহের চিহ্ন লাগিয়ে পরম নিশ্চিন্তে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে, এরা কোন বাড়ির মহিলা? একই পৃথিবীর, একই শহরের, একই গলির, একই বিল্ডিংয়ে থেকেও ওর জীবন এইসব মহিলাদের জীবন থেকে এতোটা ভিন্ন কেন?

জল ভরে এলো লতার চোখে। লতার সঙ্গে সঙ্গে সকিনাও কাঁদতে লাগল, কাঁদতে লাগল মিস ওব্রায়নও। কেননা চোখের জলের সঙ্গে নামের বা ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের স্থান মানুষের মনে, যে মন সবাইকে একইভাবে কাঁদায়, একইভাবে হাসায়।

লতা হঠাৎ অনুভব করল কে যেন হাত রেখেছে ওর কাঁধে। মুখ ঘুরিয়ে দেখে —এক মাঝ বয়সী মহিলা। বোঝা যায় যৌবনকালে অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন, ওকে অত্যন্ত কোমল দৃষ্টিতে দেখছেন। চোখ দিয়ে তাঁর জল পড়ছে। মহিলা মুখে কিছু না বলে ওকে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল লানা।

সে রাতে লানা ওব্রায়ন ঐ মহিলার সঙ্গে বান্দ্রার বাবুলাল ডান্স মাস্টারের বাড়িতে এল। মহিলা বাবুলাল ডান্স মাস্টারের বউ সাবিত্রী। বাবুলাল ফিল্মে কাজ করত—কাজ যতো না করত, তার চেয়ে বেশি খোঁজ-খবর রাখত। মাঝে মাঝে এক আধটা ছোটখাট কনট্রাক্ট পেয়ে যেতো। কখনো অভুক্ত, কখনো অর্ধভুক্ত থেকে জীবন কেটে যাচ্ছিল তার। লানাকে নিয়ে সাবিত্রী বাড়িতে ঢুকলে ওর রূপ রং আর উছলে পড়া যৌবন দেখে বাবুলাল খুশিতে ডগোমগো হয়ে উঠল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেলো। বাবুলালের ইচ্ছে লানা, যে আবার লতায় রূপান্তরিত হয়েছে, ফিল্মে কাজ করে। কিন্তু সাবিত্রীর ইচ্ছে লতা বাড়িতে মেয়ের মতন থাকুক। ওর রোজগারে খাওয়া ঠিক নয়।

বাবুলালের গোপন ইচ্ছে লতাকে বিয়ে করে ওর রোজগারের টাকায় নিজের অধিকার কায়েম করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কয়েকদিন ধরে গুজগুজ ফুসফুস চলতে লাগল। শেষে অবস্থা ঝগড়া মারপিটের পর্যায়ে চলে গেল। একদিন বাবুলাল সাবিত্রীকে মারধোর করে বাড়ি থেকে বার করে দিল। সাবিত্রী কাঁদতে কাঁদতে তার ট্যাক্সি ড্রাইভার বন্ধুর কাছে চলে গেল। গত ছ বছর ধরে তারই সঙ্গে ওর

গোপন সম্পর্ক। লতাকে ফিল্মে কাজ আর বিয়ে করার প্রলোভন দেখিয়ে বাবুলাল নিজের বাড়িতে রেখেছিল। বেশ কয়েকটা মাস এভাবে কেটে গেল। ইতিমধ্যে বাবুলাল লতাকে বিয়ে না করলেও লতার প্রতি ওর ব্যবহার ছিল দয়ালু প্রেমিক স্বামীর মতো। জীবনে এই প্রথম লতা কিছুটা সুখ পেল, কিছুটা আনন্দ উল্লাসের ঝলক অনুভব করল। মেয়েরা যখন কনে সাজে, লাল বেনারসী পরে, চোখে খুশির অশ্রুজল নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে—সে সময় মেয়েরা এসব সুখের সঙ্গে পরিচিত হয়। কিন্তু ওর যদিও বিয়ে হলো না, বরযাত্রী এলো না, বিয়ের পিঁড়িতে ওকে বসতে হলো না, তবুও ও বাবুলালের পা আঁকড়ে ধরল। নিজের দেবতা বলে মেনে নিল ওকে।

কয়েক মাস বেশ সুখেই কাটল। তারপর বাবুলাল বেকার হয়ে পড়ল। বাড়িতে এক দানা বাদামভাজাও নেই এমনই অবস্থা। ওর আবার কোকেন খাবার বদ অভ্যাস ছিল। যখন আর কোকেন খাবারও পয়সা রইল না, তখন ও অস্থির হয়ে উঠল। একদিন রাতে ফিল্ম ডিরেক্টার ডি. রায়কে ডেকে আনল। ডি রায় বেশ অভিজ্ঞ পুরনো ডিরেক্টর। এ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চান্নটা ফ্লপ ফিল্ম তৈরী করেছেন। লতাকে দেখেই উনি অনুমান করে নিলেন ভবিষ্যতে এ একজন টপ হিরোইন হবে। ড্যান্সমাস্টারের কাছে অবহেলায় পড়ে রয়েছে। ওকে যদি এখান থেকে নিয়ে গিয়ে ভালো মতো পালিশ আর রঙিন সিল্ক ও সাটিনের ওপর রাখা যায়, তাহলে পঞ্চান্নটা ব্যর্থ ফিল্মের ডিরেক্টরের বাকি জীবন পালটে যেতে পারে। ডি রায় লতাকে দেখে বললেন—"আমি এর ওপর পালিশ চালাব। এমন খাসা পালিশ করব না··" ডি রায়ের জিভে জল চলে এলো।

কিছুই বুঝে পেল না লতা। কাঁদতে লাগল। বাবুলালের পা জড়িয়ে ধরে, চুল খুলে বাবুলালের পায়ে বেঁধে পড়ে রইল। কিন্তু তবুও বাবুলাল ওর অনুরোধ রাখল না। ডি রায় তার নতুন ছবির জন্য বাবুলালকে তিন হাজার টাকার কনট্রাকট করিয়ে নিয়েছেন। ঐ ফিল্মে ডান্সার রূপে মিস মধুবালা এবং তার ড্যান্স মাস্টার হয়ে বাবুলাল কাজ করছে। ফিল্মে একটা ডান্স যদি হিট করে যায় তাহলে বাবুলালের কপাল খুলে যাবে। লতার কি হবে? একবার সফল হলে এমন হাজার হাজার লতা আখছার পাওয়া যাবে।

ক্রন্দনরত লতার কথা চিন্তা না করে বাবুলাল ওকে লাথি মারতে মারতে ডি রায়ের হাতে তুলে দিল। বিয়ে না করলেও বাবুলালকে ও নিজের স্বামীর চোখে দেখত। ও খুব কাঁদল, চিৎকার করল। কিন্তু বাবুলালকে এসব মোটেই প্রভাবিত করতে পারল না। বাবুলালের এখন কোকেন এবং

তিন হাজার টাকার বিশেষ দরকার। যেহেতু প্রয়োজন আবিষ্কারের জননী, সেই কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া এবং তাকে ডি. রায়-এর কাছে হস্তান্তরেরও প্রয়োজন আছে। ডি. রায় কয়েক মাস ধরে লতার ওপর এমন পালিশ চালালেন যে কোলাপুরের লতা ধরমারকর, মজুরের সাকিনা এবং বাইকুল্লার লানা ওব্রায়ন ফিল্মী দুনিয়ার ঝকমকে তারকা 'মিস রানীবালায়' রূপান্তরিত হয়ে গেল।
এখন বেডরুমে দুধ সাদা প্লাষ্টিকের পালঙ্কে আধশোয়া অবস্থায় সিগারেট খেতে খেতে এসব কথা মনে পড়ে যায় ওর। পুরনো জীবনের ছবি সিনেমার ছবির মতো ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এখন সারা ভারত ওর রূপগুণের মর্যাদা দেয়। সুন্দর একটা বাংলো আছে ওর। ব্যাঙ্কে লাখ টাকা রয়েছে। একটা বুইক গাড়ি, একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুর এবং এক জন জোহুজুর স্বামী আছে। ও সব সময় নতুন নতুন জো হুজুর স্বামী পোষে। এ পর্যন্ত তিনবার বিয়ে করেছে ও, আর প্রত্যেক স্বামীকেই জুতোর তলায় দাবিয়ে রেখেছে। অন্যান্য নায়িকারা এবং পরিচিত লোকেরা ওর এই ব্যবহার ভালো চোখে নিতে পারে না। তারা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোন পরামর্শই প্রভাবিত করতে পারে না ওকে। কেউ ওকে একদিন আকালের মধ্যে পড়ে বিক্রি করে দিয়েছিল, কেউ ওকে জুয়ার বোর্ডে হেরে গিয়েছিল, কেউ ওকে একটা ক্যাবারের জন্য, কেউ ওকে একটা নতুন কনট্রাকটের জন্য ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। প্রত্যেকবারই ও লাল জোড় পরে, নাকে সোনার নথ, সিঁথিতে সিঁদুর, পায়ে মল আর হাতে মেহেদি লাগিয়ে নিজেকে পনেরো বছরের কিশোরী সাজিয়ে নিজেকেই ধোঁকা দেবার চেষ্টা করে। ও এখন মণ্ডপের বধূ, সেখানে বিশেষ মন্ত্র পড়ে ওর বিয়ে হয়। ওর বাবা মা এখন ওরই বাড়িতে থাকে। নববধূর মতো লজ্জা নম্র নেত্রে ও স্বামীর ঘরে যায়। শানাই বাজে। ওর ভাই কাঁদতে থাকে, আর ও পালকি চেপে সেজেগুজে শ্বশুরবাড়ি যায়। জীবনে যে সুখ নারীরা একবারই লাভ করে, তা ও তিন তিনবার পাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রতিবারই তার স্বাদ ওর কাছে বিস্বাদ ঠেকেছে। কেননা যেদিন ও প্রথম মেয়ে থেকে নারীতে পরিণত হলো, সেদিন কোন পালকি ছিল না, লগ্ন ছিল না, বাজেনি শানাই। এক অন্ধকার ঘুপচি ঘরে, দুর্গন্ধ যুক্ত বিছানায়, ভাঙা চিমনির আলোয় দুটো মোটা মাতাল ঠোঁট, নাঁকি কান্নার শব্দ ও এক যন্ত্রণার আর্তনাদ···। কেউ ওর সমস্ত সম্পত্তি, সৌন্দর্য, পুরো জীবন নিয়ে নিক, পরিবর্তে ওকে কেবল একটা দিন দিয়ে দিক—যে দিন ওর জীবনে কখনো আসেনি।
এই সময় বাড়ির উঠোনে শানাই বেজে উঠল আর এক অপরাধীর মতো কেঁপে উঠল ও।
দাসী ঘরে ঢুকে বলল—"উঠুন মহারানী, লগ্ন তৈরী।"
জ্বলন্ত সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে ও আড়মোড়া ভেঙে উঠল। আয়নায় নিজের লাল জোড়, লাল চুড়ি পরা চেহারাটা দেখল। তারপর মাথায় একটু ঘোমটা টেনে ঘরের বাইরে গেল। আজ ওর চতুর্থ বিয়ের দিন।

বিলাস

অফিসে আপার ডিভিসন ক্লার্ক পাঁচজন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় লালারাম আসরে। তার ছোট আসারাম, তার ছোট রামলাল, তার ছোট ডি. এল. শর্মা এবং সবার ছোট সর্দার অজিত সিং। এরা সবাই সেক্রেটারিয়েটের ক্যান্টিনে বসে খাচ্ছিল।

খেতে খেতে বিলাসী মানুষদের মতো এরা বেশ মুখরোচক আদিরসাত্মক বিষয় নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছিল। এই সময় তাদের চোখে মুখে এমন কামার্তভাব ও তৃষ্ণাত অবস্থা ফুটে উঠছিল, যে তাদের স্ত্রীরা সে দৃশ্য চোখে দেখলে হয় লজ্জায় মাথা নিচু করে মাটিতে মিশে যেতো, নয়তো তাদের বালবাচ্চাদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যেতো।

আলোচনায় যদিও সব ক্লার্কই অংশ নিচ্ছিল, তবু ওরই মধ্যে সর্দার অজিত সিং, যার বাবা পি ডবলিউ ডি-র ঠিকাদার ছিলেন, বেশি কথা বলছিল। আর কেউ যদি চুপ করে কথা না বলে থাকে তো সে লালা রাম আসরে। তার একমাত্র কারণ সারা জীবনে সে কখনো এসব ধরনের আয়েস বিলাস করে নি। মুখ হাঁ করে সে অন্যদের কথা এমনভাবে গিলছিল, যেন কেউ তাকে আলিফ-লায়লার কাহিনী শোনাচ্ছে।

সর্দার অজিত সিং বলল, "আরে বন্ধু ফূর্তি তো পাহাড়ে, এখানে শহরে সে সব কোথায়। একবার আমরা মুসৌরি গিয়েছিলাম। দারজী (সরদার জী, সরদার অজিত সিং-এর বাবা) আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ওখানে স্কেটিং করতে গিয়ে একদিন এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্সের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। ও বেশ ভালো স্কেটিং করে—যদিও তার এক বছর আগে আমি মুসৌরিতে স্কেটিং চ্যাম্পিয়ানশিপ জিতেছিলাম। তাই দাদ. ঐ নার্সটা আমার ওপর···।"

লালা রাম আসরে কথার প্রসঙ্গ এবার বেশ্যা সংক্রান্ত বিষয়ের দিকে ঘোরাতে চাইল। লালা আসারামেরও তেমনই ইচ্ছা, কারণ লালা রাম আসরের মতো সেও কখনো পাহাড়ে যায়নি। তবে হ্যাঁ, একবার বন্ধুদের সঙ্গে এক বেশ্যার বাড়িতে গান শুনতে গিয়েছিল। তাই সে ঐ ফূর্তির নিজস্ব কাহিনী শোনাতে চায়। কিন্তু সর্দার অজিত সিং তাকে কথা বলতে দিতে চায় না। সে লাফিয়ে উঠে বলল—

"আরে ফুঃ, কি যে বলছ, লালারাম আসরেজী। বেশ্যাবাড়ি যাওয়াটাকে তুমি ফুর্তিবাজি বলে মনে করো? হা··· হা···হা··· একেবারে বোকা তুমি। সারাটা জীবনে তো দিল্লির বাইরে কোথাও গেলে না। ফুর্তি কাকে বলে তার তুমি কি জানো? আরে দাদা সে একবার হয়েছিল, আমরা তখন ডালহৌসি পাহাড়ে

গিয়েছিলাম। দারজীও আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। ডালহৌসি থেকে দশ মাইল দূরে একটা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সে জলে স্নান করলে নাকি চামড়ার যাবতীয় রোগ সেরে যায়। তাই দাদা আমরা ওখানে গেলাম। বহু দূর দূর থেকে পাহাড়ি মেয়েরা স্নান করতে এসেছে। সেখানে আমি একটা পাহাড়ি ছুকৃরি দেখলাম, আহ্, দেখতে যে কি সুন্দর তা আর কি বলব।

লালা আসারাম ঠোঁট চাটতে চাটতে জিজ্ঞেস করল, "জি, বি, রোডে যে মীরা গান গায় তার থেকেও সুন্দর ?"

"আরে ঐ পাহাড়ী মেয়েটার রূপের কাছে মীরা তো কিছুই নয়", সর্দার অজিত সিং জলে উঠে বলল, "আমরা শুনেছিলাম পাহাড়ী মেয়েরা গান শুনতে পেলে আর কিছু চায় না। আর আমি তো খুব ভালোই গান গাই। গড় মুক্তেশ্বরের মেলায় এই গান গেয়েই তো পুরস্কার জিতেছি, সে কথা মনে পড়তেই একটা পাহাড়ী সুর ভাঁজতে শুরু করে দিলাম। ব্যস তারপর আর কি, হা হা হা— ও মেয়েটা আমার ওপর একেবারে…।"

লালা রাম আসরে বয়স ও চাকরি সূত্রে ওদের সবার থেকে বড়। ফূর্তির বিচারে এভাবে বাজি জিতে যাক তা ওর পছন্দ নয়। ও কখনো পাহাড়ে যায়নি, তবু সে অজিত সিং-এর কথা বন্ধ করবার জন্য, এক নতুন কাহিনী শুরু করতে গিয়ে বলল—

"একবার আমরা কালকাজী গিয়েছিলাম…।"

"ছ্যাঁ…ছ্যাঁ…ছ্যাঁ", সর্দার অজিত সিং সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গের সুর টেনে বলল— "কালকাজীকে তুমি পাহাড় বলে মনে করো ? হা… হা… হা।"

রাম আসরে সঙ্গে সঙ্গে চুপ মেরে গেল।

সর্দার অজিত সিং তার ভাষণ চালু রেখে বলল—"পাহাড় এই রকমই হয়, যেমন সিমলা, মুসৌরি আর কুলু। আরে দাদা ফুর্তি তো করলাম কুলুতেই বেশি। একবার হলো কি আমরা কুলু গেলাম…।"

"দারজীও কি সঙ্গে ছিলেন ?" লালা আসারাম রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"না ছিলেন না," অজিত সিং অত্যন্ত শান্তভাবে উত্তর দিল, "উনি সেবার কাশ্মীর চলে গিয়েছিলেন। তাতে ভালোই হলো, কেননা দারজী সঙ্গে থাকলে লুকিয়ে চুরিয়ে ফুর্তি করতে হতো। ফলে এবার একেবারে খোলাখুলি…অ্যাঁ… তুমি বুঝতে পারছ তো ?"

"সব বুঝতে পারছি," লালা রাম আসরে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মাথা দুলিয়ে এমনভাবে বলল, যেন কোন ফাইলের ওপর নোট লিখছে।

"তা দাদা আমি একাই কুলু গেলাম। কুলুর গিদ্দি পাহাড়ের মেয়েরা দেখতে ভারি চমৎকার। মনে হয় ছুঁলেই যেন ময়লা হয়ে যাবে। তবে ওরা বড্ড গরিব। ওরা তামাক খেতে খুব ভালোবাসে। আমার এক বন্ধু রঘুবর দয়াল তখন আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। ও আজকাল ডেপুটি কালেক্টরের কাজ করছে। ও আমাকে বলেছিল কুলুর মেয়েদের এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা সিল্কের রুমাল দিলেই ওদের মন পাওয়া যায়।"

"শুধু এতেই?" লালা রামলাল বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞেস করল, "একটা সিগারেট আর একটা সিল্কের রুমালেই কাজ শেষ?"

"আবার কি ভাই।" সর্দার অজিত সিং অত্যন্ত দয়ার দৃষ্টিতে এই ক্লার্কদের দিকে তাকিয়ে বলল— "আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি ওরা বড় গরিব। ওদের পকেট ফাঁকা। আর তুমি তো জানো যাদের পকেট ফাঁকা, তাদের জোরও নেই।"

উত্তরে রামলাল জোলো হাসি হেসে মাথা নাড়ল। মাসের শেষ দিনে প্রত্যেক ক্লার্কের পকেটই ফাঁকা থাকে। শূন্য পকেটের দুঃখও বোঝে। ওর পাঁচ পাঁচটা বাচ্চা—সবকটারই কুৎসিত হাল। বউ আছে। বাচ্চাকটাকে বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে বৌয়ের ভরাট বুক শুকিয়ে আমসি মেরে গেছে। মাসের পর মাস কেটে যায় রামলাল চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখার সময় পায় না। ফুলের সুগন্ধ ওর নাকে এসে লাগে না। সুগন্ধ কি জিনিস, সৌন্দর্য কাকে বলে, বিলাস কি রকম—এসব অনুভূতি ওর নেই। বাচ্চারা একটা প্রজাপতি ধরতে পারলে যেমন খুশিতে বিহ্বল হয়ে পড়ে তেমনি ও সর্দার অজিত সিং-এর মুখে এসব কথা শুনে আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠল।

"তা দাদা," সর্দার অজিত সিং তার গল্প চালু রেখে বলল, "কুলু যাবার সময় আমি বাজার থেকে অনেককটা সিল্কের রুমাল আর এক ডজন গোল্ড ফ্লেক সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে গিয়েছিলাম···।"

"সর্দারজী কি সব কেলেঙ্কারীর কাহিনী শোনাচ্ছ?" লালা রাম আসরে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে বলল—"কোন শিখ শুনে ফেললে এখনি কৃপাণ দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলবে।"

"আরে, আমি কি নিজের পকেটে করে সিগারেট নিয়ে গিয়েছিলাম। চাকরের কাছে রাখতে বলে দিয়েছিলাম। আমার চাকরটা ছিল গাড়োয়ালী, ও খুব সিগারেট খেতে। তবে বেশ কাজের ছেলে। গাড়োয়ালে ও আমার ভালো রকম ফুর্তির ব্যবস্থা করেছিল। সেবার আমি যখন গাড়োয়ালে ছিলাম···।"

"হচ্ছিল কুলুর কথা।" রামলাল সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করল। কারণ ও তখন কুলুর

সুন্দরীদের কল্পনায় মগ্ন।
"হ্যাঁ, হ্যাঁ আচ্ছা গাড়োয়ালের কাহিনী পরে শোনাচ্ছি। আগে কুলুর গল্প শেষ করি। তা দাদা, আমরা তো কুলু গেলাম। ঘুরতে বেরোলাম ওখানে। বেড়াতে বেড়াতে পায়ে হেঁটেই কয়েক মাইল চলে গেলাম। এক সুন্দর উপত্যকার দেখা পেলাম সেখানে। উপত্যকায় এক সুন্দর পশুচারণ ভূমি। সেখানে একদল ভারি মনোরম ভেড়া চড়ে বেড়াচ্ছে। আর সেই বিচরণরত ভেড়ার দল সামলাচ্ছে এক অতি রূপসী পাহাড়ী মেয়ে। তাঁর লাল টুকটুকে ঠোঁট, কাজল কালো চোখ, আর মাখন কোমল শরীর।
"হায়", রামলালের মুখ থেকে আপনা আপনি কথাটা বের হয়ে গেল।
সর্দার অজিত সিং রামলালের এই প্রতিক্রিয়ার প্রতি মোটেই নজর না দিয়ে নিজের কাহিনী শুনিয়ে যেতে লাগল। বলল—
"ওকে দেখে আমি চাকরকে ইশারা করলাম। আমার গাড়োয়ালি চাকর পকেট থেকে গোল্ড ফ্লেকের একটা প্যাকেট বের করে দিল। মেয়েটার চোখ চক চক করে উঠল। চাকরটা প্যাকেট খুলে সিগারেট বার করল। মেয়েটা ভেড়া চরানো ছেড়ে আমাদের কাছে দৌড়ে এলো। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম—কি সিগারেট খাবে ?
ও লজ্জা পেয়ে বলল—হ্যাঁ।
চাকরটাকে বললাম—সিগারেট দাও।
চাকরটা ওকে সিগারেট দিল। খুশিতে চকমকে হয়ে উঠল মেয়েটার মুখ।
আমি বললাম, আরে বুদ্ধু একটা সিগারেট নয়, পুরো প্যাকেটাই দিয়ে দাও।
এক প্যাকেট সিগারেট পেয়ে মেয়েটা খুব খুশি। এমন কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে লাগল, যেন আমি ওকে এক প্যাকেট সিগারেট নয়, মূল্যবান একটা পাথরের হার দিয়েছি।
ও বেশ থেকে থেকে সিগারেটে সুখটান দিচ্ছে। এমন সময় আমি পকেট থেকে একটা সিল্কের রুমাল বার করলাম। কি বলব দাদা, মেয়েটাতো একেবারে লাফিয়ে আমার পাশে চলে এলো। কিন্তু আমি একটু পেছনে হটে এসে, যেদিক থেকে এসেছিলাম, সেদিকে হাঁটতে লাগলাম আর হাওয়ায় রুমাল ওড়াতে লাগলাম। মেয়েটা চুম্বকের আকর্ষণে বাঁধা পড়েছে যেন, এমনি ভাবে আমার পেছন পেছন আসতে লাগল। আমি আমাদের ডাকবাংলোয় পৌঁছে গেলাম। ওখানে পৌঁছে সিল্কের রুমালটা মেয়েটার হাতে তুলে দিয়ে, ওর হাত আমার হাতে তুলে নিলাম।"

"হায়"—অতৃপ্ত বাসনার এক আর্তনাদ আপনা-আপনি রামলালের ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ক্যান্টিনে যেদিন এসব গল্প হচ্ছিল, সেদিন রামলাল ঠিক করল, পৃথিবী ওলোট-পালট হয়ে গেলেও ও এ বছর অবশ্যই পাহাড়ে যাবে। এখন তো সবে জানুয়ারি মাস। জুনের মধ্যেই পাহাড়ে যাবার উপযুক্ত পয়সা জমিয়ে নেবে। সেদিন বাড়িতে ফিরে রামলাল ওর বউকে জানিয়ে দিল, এই জুনে মাকে, ছেলে মেয়েদের এবং ওকে নিয়ে অবশ্যই পাহাড়ে বেড়াতে যাবে। ওর বউ অবশ্য এই অদ্ভুত কথা শুনে মোটেই খুশি হলো না। উনুনে কয়লা সাজাতে সাজাতে বলল—

"আহা, পাহাড়ে কেমন করে বেড়াতে যাবে শুনি ? গায়ে পরার একটা ভালো কাপড়জামাও তো নেই।"

"খুব ভালো কাপড়ের কি এমন দরকার ?"

"কবে থেকে মার হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে। ইনজেকশান দেওয়া দরকার। পঁয়ষট্টি টাকা লাগবে। ছ মাস ধরে আজ আনব, কাল আনব করছ। এর পর আবার পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া।"

"ও ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে। শুনেছি পাহাড়ের ঝর্ণায় স্নান করলে হাঁটুর ব্যথা সেরে যায়।"

"দু মাস বাদে ছেলের মানসিক ভাঙতে হবে। তার জন্য একশোটা টাকার দরকার।"

"ও সামনের বছর হবে।"

"সামনের বছর কি করে হবে ? দেখছ না এখনই মাথায় কেমন ঝাঁকরা ঝাঁকরা চুল হয়ে গেছে। চোখের ওপর পড়ছে।"

"পড়ছে, পড়তে দাও। এ বছর আমরা পাহাড়ে যাবোই।"

পাহাড় ! ফুর্তি বিলাস ! আহ, রামলালের মুখ থেকে লালা ঝড়তে লাগল।

কিছুদিন পরে রামলাল এ প্রসঙ্গে সর্দার অজিত সিং-এর সঙ্গে কথা বলতে গেলে অজিত বিরক্তি প্রকাশ করে বলল—

"আরে তুমি পাগল হয়েছ ! পাহাড়ে যাবে, তাও আবার বৌ বাচ্চাদের নিয়ে ? তারপর আবার সেখানে গিয়ে ফুর্তি করবে ? পাহাড়ে যেতে হয়তো একলা যাও, নইলে বৌ বাচ্চা নিয়ে এমনভাবে সংসার করো, যেমন ঠিক অফিসের সঙ্গে সেঁটে আছো। তোমার পক্ষে এই দিল্লিতে বসে ফুর্তি করাই ভালো। একবার আমি বউ বাচ্চাদের নিয়ে নৈনিতাল গিয়েছিলাম। দারজীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সেখানে একদিন মল্লিতাল থেকে তল্লিতাল আসার পথে..."

এ সময় রামলাল চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল—

"সুপারিমন্টেন্ডেন্ট সাহেব ডাকছেন, যাচ্ছি,—এসে পুরো গল্পটা শুনব।"

রামলাল চলে গেল। অজিত সিং-এর গল্প সেদিন আর শুনল না ও। কিন্তু মনে মনে ঠিক করল, ও বৌ ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পাহাড়ে যাবে না, একা যাবে।

জুন মাসের মধ্যে বাড়ির লোকদের না জানিয়ে রামলাল তিনশো টাকা জমিয়ে ফেলল। এ জন্য মায়ের হাঁটুর ব্যথার ইনজেকসান আনা গেল না, ছেলের মানসিক ভাঙাও হলো না, বউয়ের জন্য শাড়ি আর ছোট ছেলের জুতো—কিছুরই ব্যবস্থা করা গেল না।

তবু রামলাল মনে মনে প্রসন্ন ছিল। ও পাহাড়ে যেতে পারবে। জীবনে এই প্রথম প্রাণ ভরে ফুর্তি করতে পারবে।

সর্দার অজিত সিং-এর সঙ্গে পরামর্শ করে ও সোলন যাবে ঠিক করল। অজিত সিং-এর মতে ফুর্তির সবচেয়ে সস্তা জায়গা সোলন। তার ওপর আবার এটা দিল্লির খুব কাছে। যাবার এক মাস আগে ও বাড়ির লোকেদের ব্লাড প্রেশারের ভয় ধরিয়ে দিল। বাড়ির লোকেদের ব্লাড প্রেশারের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে এমন ভাবে অবহিত করল এবং নিজের অবস্থা এতোই সঙ্কটজনক বলে জানাল যে, ওর বউ ভয়ে কাঁদতে লেগে গেল।

হাতের সোনার বালা বিক্রি করে ওর বউ ওকে পাহাড়ে পাঠাবার পক্ষে হয়ে গেল। রামলাল অবশ্য বলল, এখনই সোনার বালা বিক্রি করার দরকার নেই। ওর এক বন্ধু সর্দার অজিত সিং, ওর বাবা পি ডবলিউ ডি-র ঠিকাদার, ওকে তিনশো টাকা ধার দেবে বলেছে। ঐ টাকা নিয়ে ও সোলন যাবে। ওর খুব ইচ্ছে বউ ছেলে-মেয়েদের সাথে নিয়ে যায়, কিন্তু কি করবে একে পয়সার অভাব, তার ওপর আবার ব্লাড প্রেশার নইলে···

ওর মা, বউ, ছেলেমেয়েরা ওর এ কথায় একমত হলো এবং ওকে সঙ্গে সঙ্গে সোলন পাঠাতে রাজি হয়ে গেল।

সোলন গিয়ে ও দৈনিক দু টাকা ভাড়ার এক রদ্দি হোটেলে উঠল। পৌছনর দিন ও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সময়ও তখন সন্ধে, অন্ধকার হয়ে এসেছে। তাই স্নান খাওয়া করে সারা দিন রাত বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল।

পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে নিখুঁত ভাবে দাড়ি কামাল। বাড়ির লোকেদের লুকিয়ে তৈরি করা গ্র্যাফনল এর প্যান্ট পরল। টুইডের একটা পুরনো

কোট বার করল। ওটাকে ও ড্রাই ক্লিনারের কাছে দিয়ে নতুন রং করিয়ে নিয়েছিল। তারপর একটা বাহারী টাই লাগিয়ে ফুর্তি করতে বেরোল।

বেরোবার আগে পকেটে ভাল সিগারেটের প্যাকেট ভরে নিল। কোটের ওপরের পকেটে একটা সিল্কের রুমাল গুঁজে রাখল। দুটো রুমাল রাখল প্যাণ্টের পকেটে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে মেজাজে রওনা হলো।

ও জানত না ফুর্তি কি রকমের হবে। তবে হ্যাঁ, অজিত সিং-এর গল্প শুনে শুনে সে সম্পর্কে ওর নিজের মনে একটা রূপরেখা অবশ্যই তৈরি করে নিয়েছিল। সেইমতো হাঁটতে লাগল ও, হাঁটতেই লাগল। হাঁটতে হাঁটতে মনুষ্য বসতি ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেল।

অনেক দূর গিয়ে এক সুন্দর শ্যামল উপত্যকার মধ্যে একটা ছোট্ট পাহাড়ী বাড়ি দেখতে পেল। বাড়ির সামনের জমিতে এক পাহাড়ী কন্যা কাজ করছে। তার গোলাপী রং-এর গালের ওপর কালো চুল চলে পড়েছে।

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ও মুচকি হাসল।

এক অস্পষ্ট ও অপরিচয়ের মৃদু হাসি ফুটে উঠল, মেয়েটার মুখে তবে ও আগের মতোই ক্ষেতে কাজ করতে লাগল।

রামলালের মনে দোলা লাগল, অফুরন্ত আনন্দে ওর সারা শরীর ঝন ঝন করে উঠল। বিলাসের সামগ্রী একেবারে চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে।

এতো সুন্দর! এতো কাছে!

রামলাল পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করল। মেয়েটা বিরক্তির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল।

রামলাল সিগারেট খেতেই লাগল। মেয়েটা ওর দিকে আর ফিরে তাকালই না। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে রামলাল পকেট থেকে একটা সিল্কের রুমাল বার করে, যাদুকররা খেলা দেখাবার সময় যেভাবে রুমাল নাড়ে, সেভাবে হাওয়ায় নাড়াতে লাগল।

সিল্কের রুমাল হাওয়ায় নাড়িয়েও সে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারল না। সিল্কের রুমাল দেখেও মেয়েটা আগের মতই কাজ করতে লাগল। উপরন্তু রামলালের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বড্ড রাগ হলো রামলালের। বুঝে পেল না ও কি করবে। অনেক ভেবে চিন্তে ও মেয়েটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—

"কি করছ?"

"দেখতে পাচ্ছো না?" মেয়েটা উল্টে বলল, "গাজর তুলছি।"

মেয়েটা মাটি মাখা হাতে একটা গাজর তুলে ওকে দেখিয়ে আবার মুখ ঘুরিয়ে কাজ করতে লাগল।

রামলালের মাথায় ঘাম জমতে লাগল। ঐ সিল্কের রুমাল দিয়ে হতভম্বের মতো ঘাম মুছতে লাগল সে, আর ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এদিক-ওদিক কি যেন খুঁজতে লাগল —বোধহয় সর্দার অজিত সিংকে খুঁজছে।

ঠিক সে সময় হয়ত ঐ পাহাড়ী বাড়ি থেকে এক শক্ত-সমর্থ পুরুষকে বেরিয়ে আসতে দেখল ও। কিন্তু এ লোকটা সর্দার অজিত সিং নয়, এক পাহাড়ী যুবা।

পাহাড়ী মানুষটা কাছে এসে মাথা নিচু করে ওকে নমস্কার জানাল। রামলাল বুকে বল ফিরে পেল।

পাহাড়ী বলল—"কি ব্যাপার বাবুজী ? রাস্তা গুলিয়ে ফেলেছেন নাকি ?"

পাহাড়ী মানুষটার গলার স্বর অত্যন্ত মধুর ও নম্রতায় পূর্ণ। হাঁটুর কাছে ওর পাজামাটা ফাটা। জামায় অজস্র তালি।

পাহাড়ী মানুষটার বিনীত, বিনয়ী স্বরে সাহস পেয়ে রামলাল বলল—

"এই মেয়েটাকে আমার পছন্দ।"

রামলাল যে কিভাবে কথাটা বলে ফেলল এটা ভাবতে গিয়েই ও অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেল। কিন্তু বাস্তবে এখন ওর মুখের ভাবখানা এক অভিজ্ঞ পরিপক্ক বিলাসী মানুষের মতো।

পাহাড়ী মানুষটাও মেয়েটার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বলল—

"আমারও ওকে ভীষণ পছন্দ বাবুজী।"

রামলাল ওর এ কথার অর্থ কিছু বুঝে উঠতে পারল না। সবকিছু গুলিয়ে গেল ওর।

পাহাড়ী মানুষটা রামলালের এই অসহায় অবস্থার অবসান ঘটিয়ে বলল—

"ও আমার বোন।"

"ওহো"—রামলাল এবার বুঝতে পারল। ও পকেট থেকে দশ টাকার তিন তিনটে নোট বার করে পাহাড়ীকে বলল,—"যা দাম চাইবে তাই পাবে—কেবল এই মেয়েটাকে আমার কাছে···।"

পাহাড়ী মানুষটা আস্তে আস্তে মুচকি হাসল।

বলল—"বাপুজী আপনি কোথা থেকে আসছেন ?"

পাহাড়ী মানুষটা শিষ্টতা বজায় রেখে কথা বলছিল।

রামলাল বলল—"আমি দিল্লি থেকে আসছি।"

"দিল্লি থেকে," পাহাড়ী মাথা নিচু করে বলল—"অতো বড় শহর থেকে ? ও

হো! জনাব আমিও একবার দিল্লি গিয়েছিলাম। পরের দিন ফিরে এসেছিলাম। খুব বড় শহর বাবুজি। কিন্তু সেখানে তো কেউ আমাকে তার বোনকে দেয়নি।"
"কি আজে বাজে বকছ?" রামলাল ঝাঁঝ দেখিয়ে বললো—"তুমি জানো কার সঙ্গে কথা বলছ?"
"আপনি অর্থবান মানুষ। আমি গরিব পাহাড়ী। এ আমার বোন। টাকা পয়সার আমাদের বড় অভাব—সব সময়ই পকেটে টান। যার পকেট খালি তার আর কি জোর আছে বলুন। টাকা পয়সা তো আমাদের সব সময় দরকার।"
রামলাল অনুভব করল পাহাড়ী মানুষটা নরম হয়েছে। এবার ওর কাজ হবে, ও অত্যন্ত উদারতা দেখিয়ে পাহাড়ী মানুষটাকে বলল—
"আচ্ছা আমি তোমাকে কুড়ি টাকা দেব। তুমি এই মেয়েটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"
"কই দিন দেখি আপনার কুড়ি টাকা।"
রামলাল কুড়ি টাকা দেবে বলে সামনে এগিয়ে গেল। পাহাড়ী মানুষটা ওর মুখে সজোরে এক ঘুসি মারল।

একটু পরে রামলাল রক্ত মাখা ছেঁড়া-ফাটা পোশাকে মাটি থেকে অতি কষ্টে ওঠার সময় অনুভব করল পাহাড় অনেক পালটে গেছে। পাহাড়বাসীরা পকেটে এখনো কোন শক্তি অর্জন না করলেও, ঘুষিতে বেশ শক্তি অর্জন করেছে।

পবিত্র

ও অত্যন্ত ভদ্র, সরল এবং বাকপ্রিয় মানুষ। ও সেই সব কতিপয় সৌভাগ্যবান মানুষদের একজন যারা নিজেদের স্ত্রীদের মনে প্রাণে ভালোবাসে এবং অন্যের স্ত্রীর দিকে প্রশংসার চোখে তাকায় বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তাদের সম্পর্কে নিজের মনে কোন অন্যায় ধারণা পোষণ করে না। কিছু মনোবিজ্ঞানী মনে করেন এটা অসম্ভব। শালারা ঐরকম ভান করে থাকে…

ওর সৌভাগ্যবান হবার আর একটা কারণ হলো বিয়ের ঠিক দুমাস পরে ওর বউ গর্ভবতী হয়ে যায়, আর বউ যখন এক বাচ্চা ছেলের জন্ম দিল, তখন অন্য একটা শহরে ও বদলি হয়ে গেল। এই নতুন শহর ওর নিজের শহর থেকে পাঁচশো মাইল দূরে। বউ বাচ্চাকে ফেলে বাধ্য হয়ে ওকে চলে আসতে হলো। এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখ পেল ও এবং বন্ধুদের আড্ডায় প্রায়ই চতুর্থ পেগের পর নিজের অতীব সুন্দরী স্ত্রী এবং শিশুর প্রসঙ্গ টেনে এনে কেঁদে ফেলত।

এ শহর নতুন, অর্থাৎ ওর কাছে নতুন। চাকরিও নতুন, অর্থাৎ ওর কাছে নতুন। বেতনও কম, অর্থাৎ—হ্যাঁ—সবার কাছে কম। সব সময় ছাঁটাই হবার ভয়। তাই ও নিজের কাছে বউকে আনতে রাজি হচ্ছিল না। কয়েক মাস পরে পরেই ও এভাবে ভাবত। ইতিমধ্যে ওর প্রেম প্রগাঢ় হয়ে উঠল। ওর উন্মাদনা বেড়ে গেল।

"আহা! কি বলব ভাই, আমার বউকে যে আমি কতোটা ভালোবাসি। একেবারে দেবীর মতো নারী—সত্যিই পবিত্র, সরল, যেন একটা পদ্মফুল …। এ শহরে ওর মতো মেয়েই নেই।"

ও প্রতিদিন নিজের বউকে একটা চিঠি লিখত। ওর বউও রোজ ওকে একটা চিঠি লিখত। প্রতিদিন ডাকঘরে ওর অতৃপ্ত ভাবনার চর্চা হতো।

এমনিতে ও বেশ খোশ মেজাজের লোক ছিল। রূপসী চঞ্চল নারীদের সৌন্দর্য অঙ্গ প্রতঙ্গ এক চতুর জহুরীর মতো পরখ করতে পারত ও। এর পাগুলো গোল, কলার থোরের মতো বেশ মাংসওলা। ওর গায়ের রংটা কেমন নতুন সিল্কের মতো চকচকে। নাক ছুরির মতো তীক্ষ্ণ। আহ্, ওর গালদুটো যেন টকটকে পাকা আপেল। ও কেমন দেমাক নিয়ে চলে, আবার দেখ লজ্জাও আছে…

সৌন্দর্যের মাপ অনুযায়ী ওর বুক কোমর দুনিয়ার সেরা। কিন্তু আমার বউ…

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল জিনিসের দাম বাড়তে লাগল। ওর বেতন কিছু বাড়ল, কিন্তু জিনিসের দাম দুগুণ বেড়ে গেল, ওর নিজের শহরে জিনিসপত্রের দাম ঠিক ততোটা বাড়েনি। তার ওপর আবার ওর নিজের বাড়ি। কিন্তু এই নতুন শহরে তো…। এখানে ও ওর এক বন্ধুর

বাড়িতে উঠেছে। ভালবাসা—যুদ্ধ—বিরহ···
ও ওর বউকে অন্তত চারশোবার লিখেছে আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালোবাসি।
ওর বউ ওকে চারশো একবার লিখেছে—"প্রিয়তম, আমরা দুজনে চাঁদ ও চকোরের মতো।"
বউয়ের লেখা চিঠি পড়ে ও ভাবল—এটাই ঠিক। চাঁদ ও চকোর, কখনো চাঁদ আছে তো চকোর নেই। চকোর আছে তো চাঁদ নেই। যদি দুজনেই আছে তো অন্য কোন বাধা আছে—মেঘ এসে পড়ে, বৃষ্টি শুরু হয়, যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় বা বদলি হয়ে যায়।

বউকে একটা নতুন ফটো পাঠাতে লিখল।
ফোটো এলো। বন্ধুরা পদ্মফুল দেখল আর দেখল ম্যাক্সো বিস্কুট, মানে বাচ্চাকেও। ঈর্ষা করতে লাগল বন্ধুরা। রাগের কথা বলতে লাগল। খুব খুশি হলো ও।
রাত্তিরে প্রতিদিন শোবার আগে ঐ ছবি দুটো বার করে ও দেখত। বুকে ছোঁয়াত। তারপর চুমু খেয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ত। শুয়ে শুয়ে ঘুমের মধ্যে ও বউয়ের সঙ্গে স্বপ্নে কথা বলত—আহা! আমার সোনা! তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা অটুট থাকবে চিরকাল। কখনো তা শিথিল হবার নয়।

আরও দুটো বছর কেটে গেল। কিন্তু ছুটি পাওয়া গেল না। জীবন অনেকটা স্বাদহীন জলো হয়ে এলো, স্মৃতি ক্রমশই ফিকে হয়ে আসছে। এখন সন্ধে হলেই ও বন্ধুদের নিয়ে মান স্ট্রিটে ঘুরে বেড়ায়।
আরে দেখ ইয়ার ঐ মেয়েটা কেমন পাতলা ছিপছিপে। আরেব্বাস, যেন পাকা সায়ানাইড··ছুঁলে আর রক্ষে নেই। সেই গালিবের একটা শের আছে না···
কয়েকদিন ধরে মেয়েটা মান স্ট্রিটের দিকে এসে আস্তে আস্তে দক্ষিণী চক পর্যন্ত গিয়ে আবার ঐ রাস্তা ধরেই ফিরে যেতো। ওর হরিণের মতো চোখ যেন কান্নার জল দিয়ে ধোয়া। শিশিরের মতো নির্মল হাসি··। তার নিতম্বের অনুপম ছন্দ আর কোমলতা···।
কয়েকদিন ধরে ও ওকে দেখে গেল, আর ওর পবিত্র নিষ্পাপ কল্পনায় স্বপ্নের জাল বোনা হতে লাগল।
কখনো দেখা যেতো ও হালকা সবুজ রং-এর শাড়ি পরেছে, আবার কখনো নীল সালোয়ার, কখনো বা গাউন। প্রত্যেকবারই নতুন ধরনের চুলের স্টাইল। তার ওপর ভোরের শিশিরের মতো নির্মল হাসি···।

ও ওর পেছন পেছন ওকে দেখতে দেখতে পথ হাঁটতো। যেন পেট্রল বিহীন কোন মোটর গাড়ি দ্রুত ছুটে চলা কোন লরির পেছন পেছন দড়ি বাঁধা অবস্থায় যাচ্ছে।

চার পাঁচ দিন এভাবে চলার পর ওকে আর দেখা গেল না।

বন্ধুরা এ প্রসঙ্গে কথা তুললে ও বলল—"আমার বউয়ের সঙ্গে ওর মুখের খুব মিল। তোমরা তো ভালো করে দেখ নি।"

আহা! আমার বউকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি। আসলে এমন স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুবই কম যারা আমার রুচিতে···। আমার সৌন্দর্য চেতনা এখন এতোই উঁচু হয়ে গেছে যে সাধারণ সুন্দরী মহিলাদের আর আমার পছন্দ হয় না।

বন্ধুদের সঙ্গে সেদিন ও যখন মান স্ট্রিট দিয়ে যাচ্ছিল, এক বন্ধু জিজ্ঞেস করল, "এই মেয়েটার বিষয়ে তোমার কি মত?"

"দেখতে ভালো, তবে চাল চলনে কেমন যেন প্রাণ নেই।"

"আর ঐ মেয়েটা।"

"শরীরে মাংস আছে বেশ, তবে একটু বেশি ভারি···। বয়সও একটু বেশি হয়ে গেছে।···

···আহা! আমার বউয়ের কাছে এরা।"

হাসতে লাগল বন্ধুরা।

আরো একটা বছর কেটে গেল।

এখন অধিকাংশ সময় একা ঘুরে বেড়ায় ও। কারণ ওর সৌন্দর্যের মানদণ্ড অনেক উঁচু। অধিকাংশ বন্ধুদের রুচি ওর পছন্দ নয়। তাদের জীবন বস্তুতান্ত্রিক অনুভূতিতে পূর্ণ। তারা অবশ্য ভুল স্বীকার করত। তাদের যুক্তি তর্কও দুর্বল। নিজের বউয়ের প্রতি তাদের ভালোবাসা যে অসীম নয় এটা তো পরিষ্কার, কারণ তারা রাতদিন জোঁকের মতো বউকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতো না।

ওদের স্ত্রী নয় এমন প্রতিটি নারীই ওদের চোখে সুন্দরী।

ও একা পড়ে গেল। মান স্ট্রীটের লুসির পা এখন বেশ ভালো লাগতে শুরু করে ওর। ওর মনের আলোছায়ায় সে ছবি নাচতে থাকে বার বার। লুসিকে একবার··ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে জাগে। লারার কাটা থুতনি খুব চোখে ধরল ওর। বব ছাঁট চুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেটে গর্বের সঙ্গে ওর দিকে তাকাতে তাকাতে যায়···আর জামশেদজী লজিরে পার্শী যুবকের সুন্দরী স্ত্রী কুন্তোর চাকির পাটের মতো ঘুরে ঘুরে চলা···তাই এ এক অদ্ভুত নেশা।

আহা! এরা কেমন সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেয়েছেলে।

তারপর সিনেমাহলে এক মার্কিন সৈন্যের সঙ্গে যে চঞ্চল মেয়েটাকে দেখেছিল তার মুখটাও খুব সুন্দর লাগে ওর। বা! তার শরীর তেমনি আবার পুরো মুখের থেকে···হায় হায়···ওর গালের ওপর বালি বালি হালকা প্রসাধনীর ছোঁয়া··· যেন টাটকা আপেলের কোমল দানা।
তবে হ্যাঁ নিজের বউকে ও ভালোবাসত। লুসিকে ভালোবাসত। লারাকে ভালোবাসত। লণ্ড্রিওলার বউকেও ভালোবাসত। মার্কিন সৈনিকের প্রেমিকাকে ভালোবাসত। এ ভালোবাসা অত্যন্ত পবিত্র ও নির্ভেজাল। নিজের পবিত্র কথা মনে এলেই ওর হিক্কা শুরু হয়ে যেত, চোখে জল চলে আসত···আহা! অন্তরে কি অসীম ভালোবাসা নিয়ে দিন কাটছিল ওর।

আরো একটা বছর কেটে গেল।
বড়দিনের রাত। মান স্ট্রীটের কুমারী মেয়েরা সাজানো গোছানো ঝকঝকে দোকানের মতো সাজগোজ করেছে। স্বচ্ছ পরিষ্কার বিদ্যুতের আলো সরল নিষ্পাপ মুখগুলোর ওপর পড়ে কাঁপছে, আর নাচ চলছে তার তালে তালে—চক্কা চক্কা বুম চক, চক্কা চক্কা বুম চক।
বড়দিনের রাত আর ওর নিজের চার বছর ধরে অবিবাহিতের মতো এক নিষ্পাপ জীবন যাপন। কেননা নিজের বউকে ও খুব ভালোবাসত।
বন্ধুরা বলল, "আজ বড়দিনের রাত। কাল থেকে আবার নতুন বছর। এসো, তুমিও জীবনের আগুনে ঝাঁপ দাও।"
ও অবজ্ঞার স্বরে বলল, "ভালোবাসা কাকে বলে তা কি তোমাদের জানা আছে। আর প্রত্যেক মানুষেরই নিজের নিজের একটা স্ট্যাণ্ডার্ড থাকে।"
এবার বাড়ির রাস্তা ধরল ও।

রাস্তা, গলি ঘুঁজি, বাজার ওর চোখের সামনে পরিত্যক্ত রেল লাইনের মতো ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। ও হাঁটছে আর ওর মস্তিষ্কের আলোছায়ায় নাচঘরের কোলাহল, সুগন্ধ, রূপসীর পা, শাড়ির শব্দ, ঠোঁটের মৃদু হাসির ছবি ঘুরে ফিরে ভেসে উঠছে। ও দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করে। শেষে মনে হলো ওর বাড়ি বোধহয় এসে গেছে। দাঁড়িয়ে পড়ল ও। দাঁড়িয়ে পড়েই চমকে উঠল। ওর ঘরের দরজার সামনে অন্ধকারে একটা বউ সেজেগুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আরে

এতো—ওর স্ত্রী।

মুচকি হাসল ও।

একটু পরে ভালোমতো হুঁশ ফিরে পেলে ও অনুভব করল, এটা ওর ঘর নয়। দেখল এক বেঁটে মোটা বলকে জড়িয়ে ধরে ও মদ খাচ্ছে, আর বার বার বলছে— আমার আদরের সোনা, আমি তোমাকে বড় ভালোবাসি, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসায় কোন খাদ নেই···পবিত্র···নির্ভেজাল ভালোবাসা, এ ভালোবাসা কখনো ফুরিয়ে যাবার নয়।

ওর মুখের দিকে চেয়ে বেশ্যাটা নিষ্প্রাণ জোলো কণ্ঠে বলল—"হ্যাঁ বুঝেছি, আমি চাঁদ তুমি চকোর—রেডিওটা একটু খুলে দাও তো।"

দিল দৌলত ঔর দুনিয়া

বাড়ির একটা দরজা ভালোই ছিল। কিন্তু আর একটা ভাঙা। নতুন দরজা না লাগান পর্যন্ত হাজার চেষ্টা করেও কিছুতেই ওই দরজাটা বন্ধ করা যাচ্ছিল না। শোভা অনেকবার ওর স্বামী দয়ালকে নতুন দরজা লাগাবার কথা বলেছে। কিন্তু প্রতিবারই দয়াল কোন-না-কোন অজুহাতে ওর কথা এড়িয়ে গেছে।

এই ভাঙা দরজাটা একটা গলিপথের সৃষ্টি করেছে। এই পথ দিয়েই বস্তির লোক, ভাজিওলা, ফলওলা, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা, চাকরবাকররা ষোল নম্বর গলিতে যাতায়াত করে। এই দরজা দিয়ে একটু এগোলেই ষোল নম্বর গলি। রাস্তা দিয়ে যেতে চাইলে আধ মাইল রাস্তা ঘুরে ষোল নম্বর গলিতে উঠতে হয়। এইসব লোকেদের এই শর্টকাট রাস্তা বন্ধ হয়ে যাক তা দয়াল মোটেই চায় না।

এই বাড়িটা ও নতুন কিনেছে। হয়তো এ কথাটা বলাই ঠিক হবে, ওকে এই নতুন বাড়িটা দেওয়া হয়েছে। ঠিক সেভাবেই, যেভাবে ও নতুন স্ত্রী এবং নতুন একখানা মোটর গাড়ি পেয়েছে। নইলে কয়েক মাস আগেও এসব ওর স্বপ্নের অগোচর ছিল।

ওর যখন কুড়ি বছর বয়স, তখন ও চাঁচা চাঁচা অ্যাণ্ড কোম্পানিতে একশো পঁচিশ টাকার বেতনে ক্লার্কের চাকরিতে ঢোকে। প্রতি বছর দু টাকা করে ইনক্রিমেন্ট। পাঁচ বছর বাদে ওর বেতন বেড়ে দাঁড়াল একশো পঁয়ত্রিশ টাকা। এই পাঁচ বছরে ওর মা ওকে বিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওদের পরিচিতদের মধ্যে কেউই একশো পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের ক্লার্কের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হলো না। ওর মা ছেলের বিয়ে দেবার বাসনা নিয়েই মারা গেল। বাড়িতে দয়ালের আর কেউই রইল না।

এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ও মাথায় পাগড়ি বাঁধত এবং সালোয়ার কামিজ পরে অফিসে যেতো। ও এমন কষে পাগড়ি বাঁধত যে, দেখে মনে হতো কেউ বুঝি এই সাত সকালে ওর মাথায় দশ ঘা জুতো মেরেছে। ওর মুখের অবস্থাও একই রকম হতো, যখন ওর ফার্মের বস ওকে নিজের কেবিনে ডেকে কোন কাজের ভুলের জন্য ধমকাতেন। দয়ালের চেহারা সব সময় শুকনো বাঁশের মতো ফ্যাকাসে রুখু রুখু হয়ে থাকতো, আর ওর চোখ দুটোও সবসময় কোন এক অজানা ভয়ের আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হয়ে থাকত। ও ছিল একই সঙ্গে পরিশ্রমী, সংযমী, বুঝদার মানুষ। সব সময় টেবিলের ওপর মাথা নিচু করে কাজ করত। অফিসের অন্য ক্লার্করা সুযোগ পেলেই ওকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করত। মাঝে মাঝেই কোন-না কোন ছুতোয় নিজের কাজ ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে চলে যেতো। তাই ওর কাজের কোন অন্ত ছিল না। তার ওপর দিনের মধ্যে দু তিন বার ওর ফার্মের

বসের ধমক খেতো, আর ভয়ে একেবারে জোঁকের মতো হয়ে গিয়ে নিজের টেবিলের সঙ্গে লেপ্টে আস্তে আস্তে চোখের সামনে খোলা ফাইল চাটতো।

তারপর হঠাৎ একদিন এসব কিছু বদলে গেল। সেদিন লাঞ্চের আগে বস ওকে তাঁর কেবিনে ডেকে পাঠালেন। প্রতিদিনের মতো সেদিনও বসের ধমকানি খাবার জন্য ও পাগড়ি ঠিক করতে করতে উঠল। অন্য ক্লার্করা ওর দিকে আরচোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল। এই দিনচর্চা ওদের কাছে উপভোগের বিষয়।

'এবার ধমক শুরু হবে, ছুটির ঘণ্টা বাজবে', বলে এক ক্লার্ক গুণগুণ করে গান গেয়ে উঠল।

আর এদিকে কোন সম্ভাব্য আঘাত থেকে যেন নিজের মাথাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে, এমনভাবে ও মাথার পাগড়ি ঠিক করতে করতে ভীরু পায়ে বসের কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল।

অন্যান্য দিন বসের ধমকানি খেয়ে কয়েক মিনিট পরে ও যখন ঐ কেবিন থেকে বেরিয়ে আসে তখন দেখা যায় ওর ঠোঁট কাঁপছে, চোখ ছলছল করছে। সেই অবস্থায় ও নিজের টেবিলে ফিরে আসে এবং মাথা নিচু করে আবার কাজ শুরু করে দেয়। এটাই রোজকার নিয়ম। আজকেও তাই হবে।

কিন্তু আজ যেমন আশা করা গিয়েছিল, তেমন হলো না। বসের কেবিনের ভেতর গিয়ে দেখল, বসের পাশে একজন উকিলবাবু কালো কোট, কালো বো পরে বসে রয়েছেন এবং গভীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে দেখছেন। ওঁর এই দৃষ্টি দয়ালের হৃদয়ে ভয় ও দুশ্চিন্তার কাঁপন ধরিয়ে দিল। ওর মনে হলো, ও হয়তো এমন একটা ভয়ঙ্কর ভুল করে ফেলেছে, যার জন্য বস উকিল ডেকে ওর বিরুদ্ধে মামলা চালাবার কথা ভাবছেন। বিদ্যুৎবেগে ওর মন নিজের ফাইলের মধ্যে ফিরে গেল। কিন্তু ওর মন তখন এতোই অস্থির যে ভুলের কোন সূত্র ও মনে মনে খুঁজে বার করতেই পারল না। এই অল্প সময়ের মধ্যে ও ভেবেচিন্তে কেবল এটুকুই ঠিক করে নিতে পারল, ওর বিরুদ্ধে যে অভিযোগই উঠুক না কেন, তা ওকে সরাসরি অস্বীকার করতেই হবে।

হাসি হাসি মুখে বস ওকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কোনো কাকা কি দক্ষিণ আফ্রিকায় আছেন?"

"না।". দয়াল মাথা নাড়িয়ে সরাসরি অস্বীকার করল।

"মিথ্যে কথা বলো না, সত্যি করে বলো।" বস এক ধমক মেরে বললেন।

দয়ালের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল। ধরাগলায় ও বিরাট কোন

অপরাধ স্বীকার করার ভঙ্গিতে বলল, "কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো আমার কখনো চিঠিপত্রে কোন যোগাযোগ হয়নি। আমার সঙ্গে তাঁর কখনো কোন সম্পর্ক ছিল না। আমি তাঁকে কখনো দেখিনি।"

বস হঠাৎ নরম ভাব দেখিয়ে বললেন, "তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। কথা হলো কি, তোমার এই কাকা মারা গেছেন।"

"আচ্ছা!" আচমকা ওর মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল। তারপর আবার এই সংবাদে ওর খুশি হওয়া উচিত, নাকি দুঃখী হওয়া উচিত এ সম্পর্কে কোন ইঙ্গিতের আশায় থতমত খেয়ে বসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ও যেই দেখল বস মুচকি মুচকি হাসছেন, অমনি ও-ও উত্তরে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। কেননা এখন ও ঠিক বুঝতে পারছে কাকার মৃত্যুতে ওর হাসা উচিত।

"বসো।" বস সামনের একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে ওকে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

"না, না!" ভয় পেয়ে ও চেয়ার থেকে সরে কয়েক পা পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

"বসো বলছি!" বস এক ধমক মেরে বললেন।

দয়াল ভয়ে ভয়ে ছুঁচোর মতো চেয়ারের এক কোণে গিয়ে বসল।

আগে কোনদিন বস ওকে চেয়ারে বসতে বলেননি। এ যেন পৃথিবীর আবর্তন পথের বিপরীত দিকে চলা।

"ভয় পাওয়ার কিছু নেই", কালো কোট পরা উকিলবাবু চশমা ঠিক করতে করতে বললেন, "তোমার কাকা মলাবারায় মারা গেছেন। তোমার জন্য দশ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে রেখে গেছেন। আর এই শহরে একটা বাড়ি···পাঁচটা দোকান···আর ···,উকিল আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দশ লাখের বেশি আর কিছু দয়াল শুনতে পেল না। উকিলের গলার স্বর ক্রমশ দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। তার জায়গায় দয়ালের কানে জোরে জোরে সুঁ সুঁ করে সাইরেন বাজাতে লাগল। ও মাথা ঘুরে চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

উকিল এবং বস ওকে সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন। বহুকাল ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা বাড়িটা ওকে পাইয়ে দিলেন। পাঁচটা দোকানের মালিকানা ওর হাতে তুলে দিলেন এবং দশ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে ওর নামে ট্রান্সফার করে দিলেন। আর এসব কাজ হয়ে যাবার পর বস সহানুভূতি প্রকাশ করার উদ্দেশে তাঁর মেয়ে শোভার সঙ্গে দয়ালের বিয়ে দিয়ে দিলেন। কেননা দয়াল একদম একা মানুষ এবং এখন আর একা চলা কোনভাবেই ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আধুনিক মেয়ে

শোভা। এক জন ব্যবসায়ীর কন্যা। ও ধনীর জীবনে অভ্যস্ত। ও মনে করে যারা ধনীর জীবনে অভ্যস্ত তারাই কেবল ধনসম্পত্তিই সামলে রাখতে পারে। ধনসম্পত্তিতে কেবল তাদেরই অধিকার থাকা উচিত। তাই দশ লক্ষ টাকার মালিক স্বামী পেয়ে ও কারুর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। এরকম তো হয়েই থাকে। ও যা পেয়েছে তা তো ওর অধিকারের মধ্যেই পড়ে। এর মধ্যে নতুনত্ব তো কিছু নেই। যদি একশো পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনের কোন পুরুষকে স্বামী বলে মেনে নিতো তবেই সেটা একটা নতুন কিছু হতো।

এদিকে দয়াল সব সময় তার বৌয়ের কাছ থেকে ভয়ে ভয়ে থাকতো। সব সময় ওর মনে হতো ও যেন ওর বউকে নয়, ওদের ফার্মের মালিককে বিয়ে করেছে। যার ফাইলের ওপর সর্বদা 'ইওর ওবিডিয়েন্ট' কথাগুলো লিখতে বাধ্য ছিল ও। তিন মাস হয়ে গেল ও এই নতুন বাড়িতে এসেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ও এই নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। চেয়ার থেকে যেদিন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল, সেদিন থেকে এখনো পর্যন্ত ও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনি। মাঝে মাঝে ওর হাবভাব দেখে মনে হয়, যেন ও কোন দীর্ঘ আঁকা বাঁকা স্বপ্নের পথে বিচরণ করছে। লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় এখনো ওর মুখের ওপর সরলতা, অপাপবিদ্ধতা ও যাচনার ভাব ফুটে। মনে হয় ও যেন বলতে চায়, "দেখ, আমি বড়লোক হয়ে গেছি বটে, তাতে আমার কিন্তু কোন দোষ নেই।"

নতুন বাড়িতে আসার পরের দিন ও যখন প্রতিদিনকার কতো মাথার পাগড়ি বেঁধে অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে, তখন শোভা রাগে গজরাতে গজরাতে এসে ওর পাগড়ি ধরে টান মেরে বলল,—

"আজ থেকে তুমি আর অফিসে যাবে না।"

বিস্ময়ে ও ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে রইল। বলল, "কেন ?"

"ধনীলোকরা কাজ করে না।"

"কেন করে না ?"

"করে না বললাম তো।" শোভা কঠিন স্বরে বলল, "তোমার জানা উচিত তুমি একজন লক্ষপতি।"

ও ব্যাপারটা অনুভব করার চেষ্টা করল, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও অনুভব করতে পারল না লাখপতি হওয়ার ফলে ওর যোগ্যতায় কি ধরনের বৃদ্ধি ঘটেছে। ওর মনে হলো ও আগের মতোই এক অতি সাধারণ মানুষ, যার অবস্থার অবশ্যই উন্নতি ঘটেছে—অফিসে ওর ফাইল পত্তরও ওর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া

হয়েছে। এ কথা মনে পড়তেই বুকের মধ্যে ও ফাঁকা ফাঁকা অনুভব করতে লাগল। অনুভব করল বকা ঝকা, চোখ রাঙানি সত্ত্বেও ওর অফিসের কাজ ও বেশ পছন্দ করত। মাসে মাসে ও যখন এক আধটা নিভু'ল ড্রাফট লিখে ফেলত, তখন ওর হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ খেলে যেতো। অন্য ক্লার্ক'রা ওকে নিয়ে ঠাট্টা করত, তবু তাদের বন্ধু মনোভাবের মধ্যে এক ধরনের নৈকট্য ছিল। কখনো কোন ক্লার্কে'র কাছ থেকে বিড়ি চেয়ে খেতে খেতে অফিসের জানলা দিয়ে যখন বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখত। তখন নিঃসীম আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখিগুলোকে বড় সুন্দর দেখাত। বিড়ির কটু তীব্র, গরম ধোঁয়া নাক দিয়ে বার করতে করতে কিছুটা সময় তাদের সঙ্গে নীল আকাষে বিচরণ করত ও। খুব অল্প সময়ের জন্য এমন অনুভবের সুযোগ ঘটত, তবু তা ছিল বড় মনোরম অনুভবের মুহূর্ত। সঙ্গীদের চোখে এখন আর সে ঘনিষ্ঠতা নেই। সবাই কেমন এক অজানা-অচেনা চোখে ওর দিকে তাকায়, যেন ওকে জাতিচ্যুত করে দেওয়া হয়েছে।

এখন অধিকাংশ সময় ও গলিতে একটা জামগাছের নিচে ইজিচেয়ার পেতে বই পড়ে। পথ দিয়ে যারা যায় তাদের দেখে। কাল পর্যন্ত যারা ওর এতো কাছের ছিল, তারা আজকে এতো দূরের হয়ে গেল কেন। গলিতে বসে পথের লোকজনদের যেতে আসতে দেখতে ওর খুব ভালো লাগে। এক বৃদ্ধ বৃদ্ধা, তেলেভাজা বিক্রি করতে আসে। বৃদ্ধ মাথায় আলুপেঁয়াজের ঝাঁকা তুলে ফেরি করে আর বুড়ির কাছে দেয় কম ওজনের তেলেভাজার ঝাঁকা। ওরা দুজনেই অত্যন্ত বৃদ্ধ। ওরা যখন পথ চলে, তখন মনে হয় যেন জীবনের বোঝা একসঙ্গে বইতে বইতে ওরা বৃদ্ধ হয়ে গেছে। অনেক দূর থেকে আসে ওরা। হাঁপাতে হাঁপাতে গলি পথ অতিক্রম করে পাতায় ভরা গাছের নিচে বসে পড়ে। ময়ূর পাখীর মতো দীর্ঘ ছায়া কখনো ওদের মুখের বলি রেখা ঢেকে দেয়, আবার কখনো ঐ ছায়ার জন্য ওদের চোখে ভেসে ওঠা প্রেম স্পষ্ট করে দেখা দেয়। বৃদ্ধ তার ধুতির খুঁট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরায় আর একটা টান দিয়ে বুড়িকে আর একটা টান দিতে দেয়। কয়েক মিনিট আস্তে আস্তে কথা বলার পর বৃদ্ধা তার আঁচলে বাঁধা পানের ডিবে বার করে একটা পান স্বামীকে দেয়, নিজে একটা নেয়। তারপর আবার স্ত্রীর মাথায় ঝাঁকা তুলে দিয়ে বৃদ্ধ নিজের মাথায় আলু-পেঁয়াজের ঝাঁকা তুলে নেয়। দুজনে গল্প করতে করতে ওখান থেকে বেরিয়ে পনেরো নম্বর গলির সামনে মাল বিক্রি করতে বসে। এসব হল ওদের রোজকার কাজ।

এক জোড়া যুবক যুবতীও আসতো। প্রথম প্রথম ওরা আলাদা আলাদা আসে। যুবতীটি জামের ঝাঁকা নিয়ে আর যুবকটি আমের ঝাঁকা নিয়ে দুলতে দুলতে আসে। দুজনেই তরুণ। শ্যামলা রং শক্ত শরীর। মেয়েটার চোখদুটো কুচকুচে কালো, দাঁতগুলো ধবধবে সাদা। ও যখন হাসে তখন মনে হয় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর মুখের ওপর। একদিন ওরা দুজনে পেয়ারা গাছের নীচে বসে ধীরে ধীরে কিসব কথা বলছে। মেয়েটা ছেলেটার এক একটা কথায় খিল খিল করে হেসে উঠছে। দয়ালের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, একবার ওদের পাশে গিয়ে বসে। জামের সুগন্ধ শোঁকে, আমের দরদাম করে। মেয়েটা হঠাৎ ওপরে চোখ তুলে তাকিয়ে ডালে ঝুলতে থাকা পেয়ারার দিকে দেখল। ছেলেটা ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে পেয়ারা ছিঁড়বে বলে ওপরে হাত তুলল। তখনই দেখতে পেল দয়াল ওদের দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ও। যেন কিছু দেখতে পায়নি, যেন ঐ হাসির সম্মানে বাগানের সমস্ত পেয়ারা ছিঁড়ে নেবার আহ্বান জানাচ্ছে এমনি ভাব দেখিয়ে দয়াল তখনই মুখ ঘুরিয়ে নিল। ডাল নিচে নেমে আবার উঠে যাবার আওয়াজ শোনা গেল। পাতায় পাতায় ঘষা লেগে তালির মতো বেজে উঠল। ঘন কালো চোখের ছেলেটা মেয়েটির হাসির শব্দ উপভোগ করছে। দয়ালের ইচ্ছে করছিল, একবার ওদের দেখে আর সমস্ত পেয়ারা পেড়ে ঐ মেয়েটির কোঁচড়ে ঢেলে দেয়। ঐ আমওলা যুবক ছেলেটির সমস্ত আম কিনে নেয়, কিন্তু তা ও এখন করতে পারে না। ওদের কাছে ও অজানা অচেনা মানুষ। একজন লাখপতি মানুষ। এখন ও সাধারণ মানুষের মতো কথা বলতে পারে না। এ ধরনের কথা মনের মধ্যে ঢুকে পড়তেই এক বিচিত্র কামনা এবং নিরাশায় ওর মন বিষম ভারি হয়ে উঠল। একইসঙ্গে ছেলেটি ও মেয়েটির হাসার শব্দ শুনতে পেল। ও আর শোভা তো কখনো একসঙ্গে হাসেনি। শোভার কাছে অতি সুন্দর সুন্দর সব শাড়ি আছে, ওর মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। কিন্তু তবু ওরা দুজনে কখনো একসঙ্গে হাসেনি।

সেদিনের পর থেকে আমওলা ছেলেটি এবং জামওলা মেয়েটি একসঙ্গে আসতে লাগল। কখনো ওরা পেয়ারা গাছের নিচে বসে, আবার কখনো দূরে দূরে বসে। প্রতি দিনই একটা বিশেষ সময় ওরা চোখে চোখে কথা বলে। চোখে চোখে কথা বলাটা আসলে আমওলা যুবক ছেলেটির প্রতি পেয়ারা পাড়ার আর কি। আদেশ এখন চোখে চোখে এই তিনজনের মধ্যে এক অদ্ভুত সমঝোতার সৃষ্টি হতে চলছিল। চোখে চোখেই কথাবার্তা হতো। রোজ-

দয়াল ওদের দুজনের আসার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে উঠত। একদিন তো দয়াল সাহস করে আমওলা যুবকটির কাছ থেকে আম কিনে নিল। আম কেনায় খুশি হয়ে ছেলেটা বলল,

"জাম নেবে না?"

"না।"

"না বাবু, নাও", ও অনেক করে বলল, "আম খাওয়ার পর জাম খেলে বদহজম হয় না। জাম আমের দোষ কাটিয়ে দেয়।"

"পুরুষের ভবঘুরেপনায় যেমন বউয়ের সেবায়…" ফস করে ওর মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল।

বলে ও বেশ জোরে জোরে হাসতে লাগল। তারপর বেশী অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছে ভেবে বিব্রত বোধ করে পেছনে সরে এল দয়াল। মেয়েটা জাম ভর্তি হাত দয়ালের দিকে এগিয়ে ধরল। সে সময় মেয়েটার মুখের ওপর পাকা ফলের মতো মনোমোহিনী মাদকতা ছড়িয়ে পড়ল।

দুটো ছোট ছোট বাচ্চা মেয়ে বেগুনি রং-এর ফ্রক পরে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে, চুলে রঙিন রিবন লাগিয়ে, পাখিদের মতো কল কল করতে করতে স্কুলে যাবার সময় এই শর্ট কাট পথ ধরে যেতো। যাবার পথে মুগ্ধ চোখে ফুলের গাছগুলো দেখত। একদিন ও সাহস করে বাচ্চা দুটোকে দুটো গোলাপ ফুল দিল। ও যেন মেয়েদুটিকে রাজকুমারীর সমান স্তরে স্থান দিয়েছে, তেমনি আত্ম মর্যাদার সঙ্গে ওরা ফুল দুটো হাতে তুলে নিল। যদিও ওদের বেগুনি রং-এর ফ্রকের কাপড় ছিল খুবই সাধারণ মানের এবং পরিষ্কার হলেও এখানে সেখানে রিপু করা বলে মনে হচ্ছিল, তবুও ওরা সত্যিই রাজকুমারী। সেদিন এবং তারপর প্রতিদিন দয়ালের কাছ থেকে ফুল নিয়ে দয়ালকে কৃপা করছিল এবং এতে দয়ালের আনন্দের আর শেষ ছিল না।

এরা ছাড়াও আরো এমন অনেকে ছিল যাদের সকাল সন্ধে আসতে যেতে বহুবার গলিতে দেখেছে। আলো ছায়ায় ঘেরা এই গলিপথ এতোই মনোরম যে যাতায়াতের পথে লোকে বাধ্য হয়ে এখানে দম নেয়, বুক ভরে নির্মল বাতাস নেয়। কয়েক মুহূর্ত খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে হেসে-খেলে কথা বলে; ফলে, পাতায় পরিপূর্ণ গাছের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, দেখে পৃথিবী দুঃখ, ব্যথা, বেদনা নিয়েও সুন্দর। এই গলিপথে বিশ্রাম করে ওরা ওদের স্বপ্নকে একজোট করে। তার আলো থেকে শক্তি অর্জন করে। তার শূন্যতার মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকা এমন কোন শক্তি খোঁজে, যা ওকে সংসারের দুঃখ এবং

কষ্টর মোকাবিলা করার শক্তি দেয়। তার কিছুক্ষণ পরে নিজের শূন্য শরীরকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাধুর্যে পরিপূর্ণ করে আগে চলে যায়। এসব তাদের রোজকার নিয়মের মধ্যে পড়ে।

কিন্তু এই খোলা গলিপথ শোভার একদম পছন্দ নয়।

ও একদিন বলল, "এ গলি আমাদের, এরা এখান দিয়ে কেন যায় ?"

"যায়, কিন্তু আমাদের তো কিছু নেয় না।"

"না নিক, যাবে কেন ? তুমি ছুতোর ডেকে দরজা ঠিক করিয়ে নাও।"

দিন কয়েক টালবাহানার পর ছুতোর মিস্ত্রিকে ডেকে আনতে হলো। সে দেখে-শুনে জানাল, এ আর মেরামতি করা সম্ভব নয়, নতুন তৈরি করাতে হবে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দয়াল ছুতোরকে বিদায় জানিয়ে দিল।

এদিকে শোভা তার জেদ ধরে বসেই রইল। ও নিজে থেকে ছুতোরকে দরজা তৈরির অর্ডার দিয়ে দিল। কয়েক হপ্তা পরে জানা গেল ছুতোর মিস্ত্রি অ্যাডভান্স নিয়ে চলে গেছে। আসলে এটাও দয়ালের একটা চাল। ও নতুন দরজা লাগিয়ে গলিপথ বন্ধ করে দিতে চায় না। কিছুদিন পরে শোভা নতুন একজন ছুতোর মিস্ত্রি ডেকে তাকে দরজা তৈরির অর্ডার দিল, কয়েক হপ্তা পরে যে নতুন দরজা তৈরি হয়ে এলো তাতে তালা লাগাবার ব্যবস্থা নেই। শোভা বিরক্ত হলো। জিজ্ঞেস করে জানা গেল দয়াল নিজেই এমন অর্ডার দিয়েছে। এ নিয়ে শোভা দয়ালকে এক হাত নিল। আর দয়াল মাথা নিচু করে ঘরের বসের মুখ ঝামটা শুনতে লাগল। শোভা মিস্ত্রিকে তালা লাগাবার ব্যবস্থা করে দিতে বলল এবং তালা লাগাবার ব্যবস্থা করে দেবার আশ্বাস দিয়ে সেই যে চলে গেল, কিন্তু সে কিছুদিন এ মুখো হলো না।

তারপর বাড়িতে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যার জন্য কিছুদির অন্তত এদিকে শোভার মন রইল না। অন্তত দয়ালের মনে হলো ও দরজার ব্যাপারটা ভুলে গেছে। হয়েছিল কি বর্ষা শুরু হওয়ার ফলে শোভার বেডরুম লাগোয়া বাথরুমে কেঁচো আসছিল। পাতলা পাতলা, লাল লাল কেঁচো। কাঁচা কাঁচা নগ্ন মাংস-পিণ্ডর কেঁচো। মাটি ঘষটে ঘষটে এমন কিলবিল করে চলে, যে দেখলেই শোভার গা ঘিন ঘিন করে। ও চিৎকার করে দয়ালকে ডেকে ওগুলো দেখায়।

দয়াল খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারল বাথরুমের বাইরের একটা সিমেন্টের পাইপ, যেখানে মাটিতে গিয়ে মিশেছে, সেখানে ফেটে গেছে। ঐ ফাটা জায়গা দিয়ে কেঁচোরা আলো হাওয়া মেখে বেরিয়ে আসছে। সিমেন্টের পাইপের ফাটা

দিয়ে বেরিয়ে পাইপের ওপর থেকে অনেকক্ষণ ধরে আলো, হাওয়া, বাতাস উপভোগ করে। একটা আর একটার গায়ে উঠে পড়ে, জড়াজড়ি করে। এভাবেই নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনে সুখ শান্তিতে কিছুটা সময় কাটিয়ে তৃতীয় প্রহর হতে না হতেই সিমেন্টের পাইপের ফাটায় মধ্যে ঢুকে আবার বিলীন হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে তাদের মধ্যে এক আধটা অতি নির্ভীক চলতে চলতে বাথরুমের দরজার কোনো ফুটো দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। আর শোভা তাদের দেখে এমন চিৎকার করে, যেন অনুমতি না নিয়েই কোন অজানা-অচেনা পুরুষমানুষ তার ঘরে ঢুকে পড়েছে। দয়াল নুন আর ফিনাইল ছড়িয়ে ঐ কেঁচোগুলোকে মেরে ফেলল। কিন্তু শোভা এতে মোটেই সন্তুষ্ট নয়।

"আমার মনে হয় বাইরের যে ফাটা দিয়ে কেঁচো বেরোচ্ছে ওটা বন্ধ করে দেওয়া দরকার।"

"কেঁচো বেরিয়ে আসছে তো আমাদের কি?" দয়াল বলল, "বেচারারা একটু রোদ পোয়াচ্ছে হয়তো।"

"আরে তুমি তো আচ্ছা পাগল। দেখছ না, এক আধটা কেঁচো আমাদের বাথরুমের ভেতর পর্যন্ত চলে আসছে।"

"ঢুকে পড়েছে যেমন, তেমনি তার ফলও ভোগ করছে," দয়াল বলল।

"না, ও ফাটা বন্ধ না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।" শোভা বলল। তারপর ঘৃণার স্বরে বলল, "তুমি কি রকম ধারার লোক, কেঁচো দেখে এতোটুকু ঘেন্না হয় না তোমার।"

দয়াল আস্তে আস্তে নিজের রোগা-পাতলা শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখল। "নিজের শরীরের কাছে সবাই অসহায়", ক্ষমা চাওয়ার সুরে ও বলল।

"আর বোকার মতো কথা বলো না"। শোভা প্রচণ্ড বিরক্তি প্রকাশ করে বলল। "আমি জানি না তোমাকে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা এখনই করতে হবে। দরকার হয় পেস্ট কণ্ট্রোলওয়ালাদের ডাকো। মোদ্দা কথা এই কেঁচোর উৎপাত বন্ধ করতেই হবে।

এ তো আর তেমন জটিল কোন কাজ নয়। লাঞ্চের আগে দয়াল একটা মিস্ত্রি ডেকে বালি সিমেন্ট দিয়ে ফাটা বন্ধ করে দিল। বাথরুমে কেঁচো আসা বন্ধ হয়ে গেল। এখন আর ওদের রোদ পোয়াবার কোন উপায় রইল না।

শোভা খুশিতে তালি বাজাতে বাজাতে ঘরের বাইরে চলে গেল।

বিকেলে খাওয়া-দাওয়ার পর সাদা জামা পাজামা পরে হাতে একটা সিগারেট নিয়ে ও পায়চারি করার উদ্দেশ্যে গলির দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখল, গলিপথ

এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত একেবারে ফাঁকা পড়ে রয়েছে। কোথাও একটা প্রাণীর চিহ্ন নেই। গাছগুলো অসহায় বন্দীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ও গলির দরজার দিকে তাকাতেই অস্তগামী সূর্যের আলোয় একটা নতুন বন্ধ দরজা এবং লোহার শেকল দেখতে পেল। দেখল শেকলের ওপর একটা ভারি তালা ঝুলছে।

মুহূর্তকালের জন্য ও বিস্ময়াহত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। ওর মনে হলো গলির ফটকে যেন তালা পড়েনি, শোভা ওর বাড়ির সামনে একটা খুব বড় ফাঁস ঝুলিয়ে দিয়েছে। এখন ওকে রাতদিন ঐ ফাঁসে ঝুলে পড়ে থাকতে হবে।

অনেকক্ষণ ধরে ও ঐ বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তারপর মাথা নিচু করে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঐ জনহীন গলিপথের অসীম নীরবতায় একা বিচরণ করতে লাগল। একা একা পায়চারি করতে করতে গলির সেইসব লোকদের কথা মনে পড়ল, যারা দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যাবে। গলিতে গলিতে ঘুরে মরবে আর ঐ পোকাগুলোর কথা মনে পড়ল যেগুলো বন্ধ অন্ধকার ড্রেনের পচা জলে সাঁতরাতে সাঁতরাতে, যে আলোয় সবার অধিকার আছে সেই আলোর প্রত্যাশায় নতুন পথ খুঁজবে।